১৯১৩-২০১৩ 1913-2013
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi Fortnightly

নব পর্যায় ৭৬ বর্ষ | ২য় সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ শ্রাবণ, ১৪২০ বঙ্গাব্দ | ২১ রমযান, ১৪৩৪ হিজরি | ৩১ ওয়াফা, ১৩৯২ হি. শা. | ৩১ জুলাই, ২০১৩ ঈসাব্দ

এ সংখ্যায় থাকছে-

* হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা ও ঈদুল ফিতরের খুতবা
* রূপক-বর্ণনার অন্তরালে
* হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?
* নাজাতের দশক ও ইতিকাফ
* রমযানের শেষ দশক
* প্রকৃত মু'মিন নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখে
* পাপ হতে মুক্তি আর পুণ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ার মাস রমযান
* ইতিকাফ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা

হে পরম করুণাময় খোদা! মাগফিরাত এবং নাজাতের দশকে
তুমি আমাদের সকলকে তোমার মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করে রাখ।

رمضان كريم

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

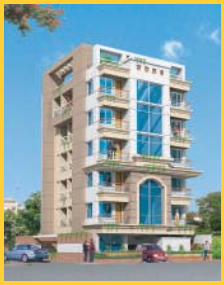

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388, 01819-296797, 01817-143100

Member | REHAB

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

LOVE FOR ALL, HATRED FOR NONE

Veronica tours & travels

Travel Agent & Tour Operator

Muhammad Belal Ahmad (Tushar)
CEO

VERONICA TOURS & TRAVELS
207/2, West Kafrul, Begum Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207
Phone: 88 02 9113176, Cell: 01733 004412, 01552 403395, E-mail: veronica@ithbd.com, tusharith@gmail.com

Our Sister Concern:
International Trading House (Garments Accessories Supplier), Hafsa Fashion Ltd. (Readymade Garments Manufacturer)
Awl Fashion (Buying Office), Color Clouds (Arts & Craft House), Bakers Bay (Bakery & Sweets)

Amecon
Since 1983
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

মাগফিরাত ও নাজাতের দশকে–সবার জন্য খুলে যাক জান্নাতের দুয়ার

আধ্যাত্মিক জীবনে বসন্তকালের সমারোহ নিয়ে আমরা পবিত্র রমযান মাসের দ্বিতীয় দশক অতিবাহিত করছি, আলহামদুলিল্লাহ্! রমযানের দিনরাত ইবাদত বন্দেগীতে রত থাকার কারণে ধর্মীয় শিক্ষা ও আদর্শের অনুশীলন ও চর্চা এ মাসে পবিত্র এক আবহ সৃষ্টি করে মানবীয় প্রকৃতির ওপর এক পরিশুদ্ধ প্রভাবের বিস্তার ঘটায়। সদাচারের পরিচর্যা আর কদাচার পরিহার-এর মাধ্যমে এ মাস ব্যক্তি মানস ও সমাজ জীবনকে পরিশীলিত করে অপরূপ এক অবয়ব দান করে। ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

অভিধান বিশেষজ্ঞদের মতে, রোযা সম্পর্কিত নির্দেশ মালা সর্বপ্রথম যখন অবতীর্ণ হয় তখন ছিল গ্রীষ্মকাল আর তাপমাত্রাও ছিল অত্যধিক। তবে তাৎপর্যের দিক থেকে রমযানের মর্যাদা এ থেকে আরও বহু বহু গুণ ব্যপ্ত। হাদীসে বর্ণিত রয়েছে–এ মাসের নাম রমযান এজন্য রাখা হয়েছে কারণ এতে গুনাহ্ জ্বলে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় (জামে' সগীর)।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন–

রমযান শব্দটিতে উত্তাপ ও দহনের তীব্রতা এবং ভস্মীভূত করে দেবার অর্থ পাওয়া যায়। অতএব এ অর্থে রমযান মাস আমাদের গুনাহ্, নেক কাজে আমাদের অনীহা ও দুর্বলতাগুলোকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবার কার্যকর এক সুযোগ এনে দেয়। আমরা যদি আমাদের নিজেদের আমিত্বকে নিজেদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলোকে একের পর এক সামনে এনে পর্যবেক্ষণ করি আর এক ব্যক্তি যেভাবে উনুনে কোন খাদ্য বস্তু ভুনা করা কালে এর এপিঠ-ওপিঠ বার বার উল্টে-পাল্টে দেখে নেয় যাতে তপ্ত পিঠের বিপরীত পিঠ অভুনা না থাকে।

তেমনিভাবে নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতাগুলোকে পরখ করে এই রমযান মুবারকেই মানবকে নিজ দোষ-ত্রুটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে রমযানের সমীপে উপস্থাপন করা উচিত, যাতে তা পরিশুদ্ধ হয়।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা যদি চিন্তা ভাবনা করেন তবে আপনাদের এমনটাই মনে হবে যে রোযা-র সাথে মানব সর্বদাই নিজ অবস্থানের স্তর অতিক্রম করে চলছে - বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে খোদার সান্নিধ্য লাভ ঘটছে তার– বিভিন্ন দৃষ্টিতে নিজের দুর্বলতা ও অপূর্ণতা অনুধাবন করে সে তা শুধরিয়ে নিচ্ছে আর আধ্যাত্মিকতার সিঁড়ি পেরিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে।

সামগ্রিক অর্থে নব এক আধ্যাত্মিক অবস্থা অতিবাহিত হতে থাকবে তার, আর সে একেকটি ধাপ অতিক্রম করে ক্রমেই এগিয়ে চলবে।....আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও আশিসের সাথে আপনি যদি পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাধনার সাথে প্রচেষ্টারত হোন তবে এ মাসে নব এক রূপে আপনার নিষ্ক্রমণ ঘটবে। (খুতবা জুমুআ, ১৫ মার্চ - ১৯৯১)

হুযূর (রাহে.) এর দিক দিশারী উল্লিখিত পবিত্র পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে রমযানে আধ্যাত্মিকতার জ্যোতির্ময় আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক আমাদের সকলের জীবন। আর মাগফিরাত এবং নাজাতের দশকে খোদা তা'লা আমাদের সকলকে তাঁর মাগফিরাতের চাদরে আবৃত করে রাখুন, আমীন।

সূচিপত্র

৩১ জুলাই, ২০১৩

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** (৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০)	৫
হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত **ঈদুল ফিতরের খুতবা** (১১ সেপ্টেম্বর, ২০১০)	১১
রূপক-বর্ণনার অন্তরালে মুহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৮
হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন? খন্দকার আজমল হক	২১
নাজাতের দশক ও ইতিকাফ মাহমুদ আহমদ সুমন	২৪
রমযানের শেষ দশক কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী	২৬
প্রকৃত মু'মিন নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখে মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৭
পাপ হতে মুক্তি আর পুণ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ার মাস রমযান মৌলবী এস এম মাহমুদুল হক	২৯
ইতিকাফ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা রশিদ আহমদ	৩১
পাঠক কলাম	৩৩
সংবাদ	৩৬
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৪০

কুরআন শরীফ

সূরা বাকারা-২

وَ اِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ؕ اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْیَسْتَجِیْبُوْا لِیْ وَ لْیُؤْمِنُوْا بِیْ لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُوْنَ ﴿۱۸۷﴾

১৮৭। আর আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি (তাদের) নিকটেই[২১০] আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই যখন সে আমার কাছে প্রার্থনা করে। সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান[২১১] আনে যাতে তারা সঠিক পথ পায়।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে এবং এ মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদ সম্বন্ধে অবগত হয় তখন তারা স্বভাবতই এ থেকে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করে। এ আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য এ আয়াতটি মু'মিনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করেছে।

২১১। 'আমার প্রতি ঈমান আনে' এ বাক্যাংশটির অর্থ এস্থলে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা নয়। কারণ পূর্ববর্তী অংশে বলা হয়েছে,'তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়'। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করলে সাড়া দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। অতএব 'আমার প্রতি ঈমান আনে' অর্থ, এ কথার প্রতি ঈমান আনা যে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

হাদীস শরীফ

রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহ্‌র ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানে (আল্লাহ্‌র ইবাদতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর শেষ দশ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না (মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল ! আমি যদি জানতে পারি কোন রাতটি কদরের রাত তাহলে আমি তাতে কি বলবো?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তুমি বলবে ***"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি"*** (অর্থাৎ –হে আল্লাহ্! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো)। (তিরমিযী)

* হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মুবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরয করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোযখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত" (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি কদরের রাত্রে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ্ ক্ষমা করা হয়" (বুখারী)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে বসতেন, এবং বলতেন, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো" (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো" (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংকলন:
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নৈরাজ্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে।

সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না? আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রীস্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনি।

আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়। দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত।

এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় দাবী রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রীস্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশা-পাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মু'মিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রীস্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা-৭৬)

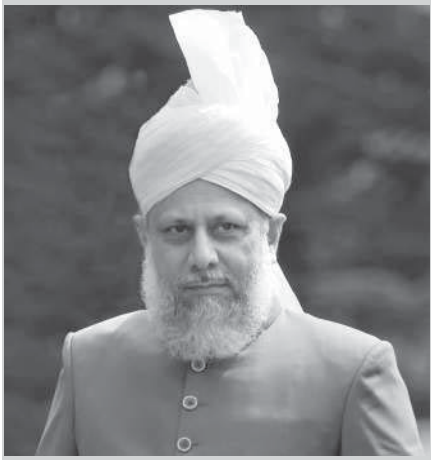

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে ৩ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা।

[সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে খুতবা না পাওয়ায় পূর্ব প্রকাশিত খুতবা পূণর্মুদ্রিত করতে হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।]

রমযানের শেষ দশক ও লায়লাতুল ক্বদর

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

হুযুর আনোয়ার (আই.) তাশাহ্হুদ, তা'উয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ

(সূরা আল আনকাবুত: ৭০)

অনুবাদঃ আর যারা আমাদের দিকে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করব। নিশ্চই আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

এটি সূরা আনকাবুতের আয়াত। এখন আমরা রমযানের শেষ দশক অতিক্রম করছি। সব মুসলমান জানে এ মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। এ দশক সেই সোপান অর্জন করার বিশেষ দশক যাতে লায়লাতুল ক্বদর আসে। বিগত খুতবায় আমি এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ননা করেছি। আজকের দিনও (জুমুআর দিন) খোদা তাআলার দৃষ্টিতে এক কল্যাণ মন্ডিত দিন যা তার সব কল্যাণসহ প্রতি সপ্তাহে আগমন করে। এতে দোয়া গৃহীত হওয়ার একটি বিশেষ মূহুর্তও আসে।

সুতরাং এ সব দিনে কল্যাণসমূহ জমা হচ্ছে, জমা হয়েছে এবং নিজ বান্দাদের প্রতি খোদা তাআলার অনুগ্রহরাজী বর্ষনের দিকে (আমাদের) দৃষ্টি আকর্ষন করছে। এ মনোযোগ সাময়িক হওয়া উচিৎ নয়, বরং আমার পঠিত আয়াতে যে বিষয় সম্পর্কে উলেখ রয়েছে অর্থাৎ খোদা অন্বেষনের জন্য চেষ্টা প্রচেষ্টা করা, সেদিকে একাগ্রতার সাথে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এ চেষ্টা প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তবে তা এক বান্দাকে খোদা তাআলার সান্নিধ্য প্রদান করে তার অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। খোদা তাআলা নিজের দিকে আসার পথ দেখাবেন। এই চেষ্টা সাধনা কিভাবে সফল হবে তা এ আয়াত থেকে পরিস্কার হয়। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, সর্বদা আমাদের সাথে সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। যখন খোদা মিলনের প্রচেষ্টা হবে তখন স্বাভাবিক ভাবেই ঐ সব বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য থাকবে যেগুলো খোদা তাআলার নিকট পছন্দনীয় এবং যা তার নিকটবর্তী করে দেয়। যেভাবে আমি বলেছি, (আমাদের প্রতি) এটি খোদা তাআলার অনুগ্রহ যে তিনি এমন পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে তাঁর দিকে অগ্রসর হওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগ সৃষ্টি হয়। এখন রমযান মাস যা আমাদেরকে এ প্রচেষ্টা ও সাধনার সুযোগ প্রদান করছে। রমযানের রোযা এবং ইবাদত সমূহও এক বিশেষ মুজাহাদা (সাধনা)।

মানুষ যদি বুঝে শুনে এ সাধনা করে, এর মূল তাৎপর্যকে উপলব্ধি করে তবে তা (মানুষকে) আল্লাহ্ তাআলার দিকে নিয়ে যাবে। সুতরাং এ আধ্যাত্মিক পরিবেশে আমাদের বিশেষ ভাবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক। এখন আমি হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করব যে কি কি বিষয় ও পন্থা রয়েছে যেগুলো অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেগুলো অবলম্বন করে এবং এসবের প্রতি মনোযোগী হয়ে আমরা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভ করতে পারি। আর ঐ সব লোকদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি যাদের সৎকর্মশীলদের দল বানিয়ে আল্লাহ্ তাআলা এক সুসংবাদ দিয়েছেন যে আমি সৎকর্মশীলদের সাথে আছি। অর্থাৎ ঐ সব লোকদের সাথে আছি যারা সৎ কাজ করে, সর্বদা পূণ্য কাজে নিয়োজিত এবং আমার পথের অন্বেষনকারী। যেভাবে আমি বলেছি, এ বর্ণনায় এখন আমরা হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি থেকে দেখব আমরা কিভাবে আল্লাহ্ তাআলার পথ লাভ করে সর্বদা ঐ দলে অন্তর্ভূক্ত থাকতে পারি যাদের সাথে খোদা তাআলা সর্বদা থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত থেকে এবং এসব আয়াত সমূহের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু এখন আমি এ বিশেষ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলব যে সম্পর্কে তিনি (আ.) বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। প্রত্যেক মানুষের সামর্থ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, তাদের চিন্তা চেতনাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। যতদূর সামর্থ ও যোগ্যতার সম্পর্ক, আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা ও শক্তির মানের বিচারে তাতে ভিন্নতা রেখেছেন। কিন্তু আদেশ এই যে যতটুকুই যোগ্যতা ও সামর্থ রয়েছে, সে অনুযায়ী আল্লাহ্ তাআলাকে অন্বেষন কর এবং নিখুঁত ভাবে অনুসন্ধান কর। এরূপ করলে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের দিকে আসার পথ দেখাবেন। কিন্তু মানবিক চিন্তা ভাবনা যদি এসব যোগ্যতা ও সামর্থের চূড়ান্ত ব্যবহারে বাধা হয়ে দাড়ায়, আত্মা যদি বিভিন্ন বাহানা খুঁজতে থাকে, সামান্য প্রচেষ্টাকে জুহ্দের

(সাধনা) নাম দেয়া হয়, তবে এর মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ তাআলাকে লাভ করতে পারবে না। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, এটা কিভাবে সম্ভব, যে ব্যক্তি নির্দ্বিধায় অলসতা করছে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় খোদা তাআলার কল্যাণে ভূষিত হবে, যে সব জ্ঞান ও শক্তি দিয়ে একনিষ্ঠ ভাবে তাঁকে (আল্লাহ্‌কে) অনুসন্ধান করে। নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তাআলাকে অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিই তাকে পেতে পারে। অথবা আমরা বলতে পারি আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্যের বিভিন্ন স্তর রয়েছে যা এক ক্রমাগত চেষ্টা সাধনার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টি আকর্ষন করে মানুষকে আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করে।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্ তাআলা বর্নিত পন্থানুযায়ী চেষ্টা করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি ইমান বিল গায়ব (অদৃশ্যে বিশ্বাস) এবং তাঁর শক্তি ও গুনাবলী সমূহের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখা, ক্রমাগত এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করে। শুধু জ্ঞানের ভিত্তিতে যদি আল্লাহ্ তাআলাকে চেনার প্রচেষ্টা করা হয় তবে আল্লাহ্ তাআলাকে দেখা সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তাআলা তাকে নিজের দিকে আসার পথ দেখাবেন না। আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য, তার পথের সন্ধানের জন্য বান্দাকেই প্রথমে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে এ বিষয়ে অন্ধকারে রাখেন নি যে কিভাবে পথের সন্ধান করতে হবে? সর্ব প্রথম এ যুগের জন্য, বরং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগ থেকে নিয়ে কেয়ামত কাল পর্যন্ত আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কুরআন মজীদ রেখেছেন যে এর মধ্যে পথের সন্ধান কর। এর পূর্বেও নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং নবীদের মাধ্যমে নিদর্শনাবলী ও অলৌকিক কার্যাবলী দেখিয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রমানও উপস্থাপন করেছেন। যেন এসব দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার দিকে আসার রাস্তা চেনা যায়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ বিষয়টির ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, যে আমাদের পথে চেষ্টা প্রচেষ্টা করবে, তাকে আমরা আমাদের পথ প্রদর্শন করব। এটিতো প্রতিশ্রুতি, আর এদিকে এ দোয়া রয়েছে যে, **"ইহদিনাস্ সিরাত্বাল মুস্তাক্বিম"**।

সুতরাং মানুষের এটিকে দৃষ্টিতে রেখে নামাযে বিনয়ের সাথে এ দোয়া করা প্রয়োজন এবং সাথে এ আশাও রাখতে হবে যে সেও যেন তাদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে যারা উন্নতি ও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে। তাকে যেন এ দুনিয়া থেকে জ্ঞানহীন ও অন্ধ অবস্থায় উঠিয়ে নেয়া না হয়। সুতরাং সূরা ফাতেহার এ দোয়া যা প্রত্যেক নামাযে সব রাকাতে আমরা পাঠ করি, এর উপর চিন্তা করুন এবং ব্যথাতুর চিত্তে আল্লাহ্ তাআলার কাছে সিরাতে মুস্তাকীমের পথ নির্দেশ চান। এরুপ দোয়া করলে আল্লাহ্ তাআলা হেদায়াত দান করেন এবং নিজের দিকে আসার পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ তাআলার নবীগণ ও প্রত্যাদিষ্টগণ নিদর্শনাবলীসহ আসেন যাতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষন করতে পারেন যে আল্লাহ্ তাআলার পথ অনুসন্ধানের চেষ্টা কর যাতে আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য লাভ করতে পার। এটি স্পষ্ট যে যখন কোন বুদ্ধিমান লোক কারো দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রেক্ষিতে কোন কাজ করে এবং এদ্বারা উপকৃত হয়, তখন স্বভাবতই সে সেই মনোযোগ আকৃষ্টকারীর প্রতিও কৃতজ্ঞ হয়ে তার সাথেও সম্পর্ক সৃষ্টি করে এবং করা উচিৎ। এটাই বিবেকের দাবী যে বেশী বেশী লাভবান হও। সুতরাং এ বিষয়টি অনুধাবন করা প্রয়োজন। যে অনুধাবন করে সে সফল হয়। পূর্বে বলে এসেছি, নবীগণ এবং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিতগণও আল্লাহ্ তাআলার পথ সমূহ প্রদর্শন করে থাকেন।

সুতরাং একজন বুদ্ধিমান মানুষের তার সাথে সম্বর্ক স্থাপন করে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা একান্ত আবশ্যক। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সা.) শেষ যুগে মসীহ ও মাহদী আসার সংবাদও দিয়েছেন, তাই খোদা তাআলার সাথে দাসত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার জন্য যিনি নির্ধারিত ছিলেন, তাঁর (আ.) প্রতি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। এর জন্য মুসলমানদের সামনে দোয়াও বিদ্যমান রয়েছে এবং অধিকাংশ সময় তা পাঠও করা হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন! না জেনে না বুঝে অস্বীকার করার পরিবর্তে আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে তাঁর পথ সমূহ পাওয়ার চেষ্টা করার অভিজ্ঞতা অর্জন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক স্থানে লিখেছেন, আমি অমুসলিমদেরও কয়েকবার বলেছি, আমাদের দোয়া শিখানো হয়েছে, **"ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম"**। তোমরা এ দোয়া পাঠ কর, কিন্তু তোমরা যদি এ দোয়াও পাঠ না করতে পার তবে নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় এ দোয়া কর যে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সোজা পথ দেখান। তাহলেও আল্লাহ্ তাআলা পথ দেখাবেন এবং তিনি বলেছেন, অনেকে আমাকে বলেছেন, এদ্বারা তাদের কাছে ইসলামের সত্যতা পরিস্কার হয়ে গেছে। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে কিছু অমুসলিম ভীত হয়ে অথবা নিজ জাগতিক স্বার্থের জন্য ইসলাম গ্রহন করেনি। কিন্তু সত্য সর্বদাই প্রকাশ পেয়ে যায়। বিশেষ ভাবে মুসলমানদের এ ব্যবস্থাপত্র পরীক্ষা করে দেখা উচিৎ যাতে আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে শুধু তার সন্তুষ্টি অর্জনই নয় বরং আল্লাহ্ তাআলার দিকে নিয়ে যায় এমন নতুন নতুন পথও পেয়ে যায়। এ বিষয়টি আমাদের জন্যও আবশ্যক। আমরা যারা আহমদী, এ যুগের ইমামকে মেনেছি, আমাদের শুধু বয়আত করে অলসভাবে বসে যাওয়া উচিৎ নয়, বরং আল্লাহ্ তাআলার সন্ধান এবং তার সান্নিধ্য লাভের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করা প্রয়োজন, বিশেষ ভাবে এ ক'দিন (রমযানের শেষ দশক) বিশেষ মনোযোগী হোন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, তোমাদের হৃদয়ে যা কিছু আছে আল্লাহ্ তাআলা সে সম্বন্ধে পূর্ন অবগত আছেন এবং তোমরা যদি সৎকর্ম পরায়ন হও তবে (স্বরন রাখ) তার দিকে যারা ঝুকে তিনি তাদের প্রতি পরম ক্ষমাশীল। সুতরাং আমরা যদি একনিষ্ঠ ভাবে তার ক্ষমা পাওয়ার জন্য তার প্রতি ঝুকি তবে তিনি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেন এবং নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার দিকে আসার আরো উজ্জল পথ দেখাবেন, মর্যাদা আরো উন্নীত হবে। আল্লাহ্ তাআলা যেভাবে তার দিকে আসার প্রচেষ্টাকারীদের পথ প্রদর্শনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তেমনি ভাবে যারা আল্লাহ্ তাআলা থেকে দূরে সরে যায় তাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার আচরন এমন হয় যে তারা অন্ধকারে নিপতিত হতে থাকে। যেমন কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ফালাম্মা যাগু আযাগাল্লাহু কুলুবাহুম ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল ক্বাওমাল ফাসিকিন"**। সুতরাং তারা যখন বক্রতা অবলম্বন করল আল্লাহ্ তাআলা তখন তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। আল্লাহ্ তাআলা দুস্কৃতিপরায়নদের হেদায়াত দেন না।

এর ব্যাখ্যা প্রদান করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, যেভাবে আমাদের পার্থিব জীবনে পরিস্কার দেখা যায় প্রত্যেক কাজের অবশ্যই একটি ফল আছে এবং সে ফল হচ্ছে খোদা তাআলার কাজ। তেমনি ধর্মীয় বিষয়েও এ নিয়ম প্রযোজ্য। যেমন আল্লাহ্ তাআলা এ দুটি দৃষ্টান্তে পরিস্কার বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** এবং **"ফালাম্মা যাগু আযাগাল্লাহু কুলুবাহুম"** অর্থাৎ যারা খোদা তাআলার সন্ধানে পূর্ন প্রচেষ্টা করে, তার এ কাজের ফল স্বরুপ তাদের আমরা আমাদের পথ দেখাব। এবং যারা বক্রতা অবলম্বন করে এবং সোজা পথে চলতে চায় না, তাদের প্রতি আমাদের এ আচরন হবে যে আমরা তাদের

হৃদয় সমূহ বক্র করে দেব।

সুতরাং এটা বান্দাদের দুর্ভাগ্য যে তারা নিজেদেরকে খোদা তাআলা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ক'দিন আগে পাকিস্তান থেকে আগত এক অআহমদী বলেন, দেশে যেসব হচ্ছে এর কারন কি? কবে ঠিক হবে? কিভাবে হবে? তখন আমি তাকে বললাম, দুটি বিষয় আমাদের সামনে রাখা প্রয়োজন। প্রথমত আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, আমার দিকে আস, চেষ্টাকর, সাধনা কর। এর উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমার সন্তুষ্টি অর্জনের সব পথ সন্ধানের প্রাণপন চেষ্টা কর, তবে আমি পথ দেখাব। আপনিই বলুন, এ দৃশ্য কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন। তখন তিনি বলেন, বরং হিসাব উল্টো । তখন আমি বললাম, যেহেতু হিসাব উল্টো তাই আল্লাহ্ তাআলার অন্য অচরন প্রকাশ হচ্ছে। সুতরাং জাতিগত ভাবে আমাদেরকে আমাদের চিন্তা ধারা ও গতি পথ ঠিক করতে হবে। আমরা যদি সৎ নিয়্যতে দেশের উন্নতি চাই তবে পাকিস্তানী জাতিকেও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষন করতে হবে। বর্তমানে পাকিস্তানের সব গন মাধ্যম হৈ চৈ করছে। পাকিস্তানেও এবং এর বাইরেও লোকেরা অনেক কথা বলছে যা এখানে আমার উলেখ করার প্রয়োজন নেই। তারা তো কিছু কথা বার্তা বলে, কিছু মন্তব্য করে বিষয়টির ইতি টেনেছে। কিন্তু অন্যায় ও বর্বরতার যে চিত্র সর্বত্র দেখা যাচ্ছে শুভ দৃষ্টি নিয়ে সেগুলো প্রতিরোধের কার্যকর প্রচেষ্টা কেউ করছে না। আল্লাহ্ তাআলা দয়া করুন।

সৎ প্রকৃতির লোকদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কেমন ব্যবহার করেন-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, মানুষের অন্তরে কয়েক ধরনের অবস্থা বিরাজ করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা করুনা স্বরূপ পূণ্যাত্মা লোকদের দুর্বলতা সমূহ দূর করে দেন এবং তাদের পবিত্র করেন ও পূণ্য করার শক্তি দান করেন। অর্থাৎ পরিশেষে নিজের পক্ষ থেকে তা দান করেন। অত:পর যখন আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যাক্তিকে পবিত্রতা ও পূণ্য দান করেন তখন তারও দৃষ্টিতে সে সব বিষয় অপছন্দনীয় হয়ে যায় যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। তার তুচ্ছ প্রচেষ্টার কারনে আল্লাহ্ তাআলা তার এ নগন্য প্রচেষ্টায় প্রবৃদ্ধি দান করেন এবং (কল্যাণের) দরজা উন্মুক্ত করে দেন। তখন ঐ সব পথ তার কাছে প্রিয় হয়ে যায় যেগুলো খোদা তাআলার কাছে প্রিয়। সে এমন এক শক্তি লাভ করে যার পর দুর্বলতার কোন সুযোগ নেই এবং এমন এক উদ্দিপনা প্রাপ্ত হয় যার পর কোন অলসতা নেই। এমন তাকওয়া প্রাপ্ত হয় যার পর কোন সীমা লঙ্ঘন নেই। দয়াময় প্রভু তার প্রতি এমন সন্তুষ্ট হয়ে যান যে এর পর আর কোন গুনাহ নেই। কিন্তু এ পুরস্কার অনেক দেরীতে লাভ হয়। প্রথম প্রথম দুর্বলতা বশে মানুষ বার বার ধাক্কা খায় এবং পদস্খলিত হয়। কিন্তু তার সৎ প্রকৃতি দেখে (আল্লাহ্ তাআলার) উচ্চ শক্তি তাকে আবার টেনে তোলে। অর্থাৎ এটি একটি স্থায়ী প্রচেষ্টা, মানুষ পদস্খলিত হয়, অত:পর আবার আল্লাহ্ তাআলার দুয়ারে আসে। এরপর আবার দূরে সরে যায় এবং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

এরপর আবার সে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত হয়ে আল্লাহ্ তাআলার দিকে ধাবিত হয়। এটি ধারাবাহিক প্রচেষ্টা যা চলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তাআলা যখন দেখেন যে সে ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তখন আল্লাহ্ তাআলার শক্তি অর্থাৎ সর্বোচ্চ শক্তি তাকে নিজের দিকে টেনে নেয়। তিনি (আ.) সেদিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যা আল্লাহ্ জালা শানুহু বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"**। সুতরাং এটি ধারাবাহিক এবং দীর্ঘ প্রচেষ্টা যার ব্যাখ্যা তিনি করেছেন। আরবীতে বলেছেন, **"নুসাব্বিতুহুম আলাত্তাকওয়া ওয়াল ইমান ওয়া নাহদিয়ান্নাহুম সুবুলাল মুহিব্বাতে ওয়াল ইরফানে ওয়া সানুইয়াস্‌সেরুহুম লেফে'লিল খায়রাতে ওয়া তারকিল ইসইয়ানে"**। সুতরাং এটি স্থায়ী ও দীর্ঘ প্রচেষ্টা যাতে তাকওয়া ও ইমানে স্থায়ীত্ব অর্জিত হয়।

অত:পর মানুষ এর উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা ও তত্ত্বজ্ঞানের পথ সে লাভ করে। পূণ্য কাজ করার এবং গুনাহ পরিত্যাগ করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন এবং এটা আল্লাহ্ তাআলার অঙ্গীকার যে তিনি সাহায্য করবেন। এক স্থানে তিনি (আ.) এর ব্যাখ্যা করে বলেন, চেষ্টা সাধনাতেই সব পূণ্য রয়েছে। খোদা তাআলা বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের দিকে আসার চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমরা তাদের জন্য আমাদের সব পথ উন্মুক্ত করে দেই। চেষ্টা সাধনা ছাড়া কিছুই হতে পারে না। যারা বলে সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী (রাহ:) এক পলকে চোরকে কুতুব বানিয়ে দিয়েছিলেন, তারা ভ্রান্তিতে আছেন। এমন সব বিষয়ই মানুষকে ধ্বংশ করেছে। লোকেরা ধারনা করে কারো ঝার ফুঁকের মাধ্যমে কেউ বুযুর্গ হয়ে যেতে পারে। মুসলমানদের মধ্যে বেশ প্রচলন হয়ে গেছে - তারা কবরে যায়, পীরদের কাছে যায়, তাবিজ-কবয নেয়, তাদের মনোবাসনা পূরনের জন্য দোয়া করায় অথবা তারা মনে করে তারা নামায পড়ুক বা না পড়ুক, এতে তাদের সব গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।

তিনি (আ.) বলেন, যে খোদা তাআলার সাথে তাড়াহুরো করে সে ধ্বংশ হয়। দুনিয়াতে যেমন সব বিষয়েই ধাপে ধাপে উন্নতি হয়। আধ্যাত্মিক উন্নতিও এভাবেই (ধাপে ধাপে) হয়। চেষ্টা সাধনা ছাড়া কিছুই লাভ হয় না। আর সেই চেষ্টা সাধনাও হতে হবে খোদা তাআলা নির্ধারিত পন্থায়, এই নয় যে কুরআন করীমের নির্দেশনার বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেই নিরর্থক ঋষিদের ন্যায় সাধনা ও ধ্যানে নিমগ্ন হয়ে যাও। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই খোদা তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন, যেন আমি পৃথিবীবাসীকে দেখিয়ে দেই, মানুষ কিভাবে আল্লাহ্ তাআলা পর্যন্ত পৌছতে পারে। এটাই ঐশী বিধান, সবাই বঞ্চিত থাকে না আবার সবাই হেদায়াতও পায় না। লোকেরা যিকরের কিছু মাহফিল বা মজলিশ বানিয়েছে। কিছু কিছু স্থানে কখনো কখনো এ অভিযোগ পাওয়া যায় যে আহমদীরা এ বিষয়টিকে বেশ প্রাধান্য দেয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সুন্নত থেকে দূরে সরে যে কাজ করা হবে তা আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য দান করতে পারে না। অথবা শুধু আলাহু-আলাহু বলে বা এ ধরনের অন্য কোন যিকির করে, কিংবা কখনো কখনো যিকির আযকারের যে দীর্ঘ মজলিশ বসানো হয়-এসব করে যদি মনে করা হয় আমাদের দায়িত্ব পালন হয়ে গেছে এবং নামায ও অন্যান্য বিষয় থেকে ছুটি পেয়ে গেছে, এটি কখনো হতে পারে না।

তিনি (আ.) বলেন, যে লোক মনে করে, আমাকে যেন কোন কষ্ট ও পরিশ্রম করতে না হয়, সে ভ্রান্তিতে আছে। আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে পরিস্কার বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"**। এ থেকে বুঝা যায় আল্লাহ্ তাআলার তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খোলার জন্য চেষ্টা সাধনা প্রয়োজন। আর সেই চেষ্টা সাধনা সে পন্থায় হতে হবে যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) এর দৃষ্টান্ত ও সর্বোত্তম নমুনা রয়েছে। বহু লোক রাসূলুল্লাহ (সা.) এর উত্তম নমুনা ত্যাগ করে পীর মুর্শিদ ও ফকিরদের কাছে যায়, যেন তারা ফুঁ মেরে কিছু করে দেবে। এগুলো বৃথা জিনিষ। এমন লোক যারা শরিয়ত মেনে চলে না এবং এমন বৃথা দাবী করে, তারা ভয়ানক পাপ করে এবং আল্লাহ্ তাআলা এবং তার রসূলের চাইতেও নিজেদের মর্যাদা বাড়াতে চায়। কেননা হেদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কাজ। সে এক মুষ্ঠি মাটি হয়ে নিজেই হেদায়াত দেয়ার দাবী করে। এসব

পীর ফকিররাও আল্লাহ্ তাআলা ছাড়াই নিজেদের হেদায়াত দাতা মনে করে। কোন তাবিজ দিয়ে দিল বা চুড়ি পরিয়ে দিল, আর বলে দিল ব্যস, তোমার সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে এবং ওমুক ওমুক জিনিষ তোমাদের হবে এবং তোমরা পূণ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেছেন, এটি খোদা তাআলার সত্যিকার প্রতিশ্রুতি, যে ব্যক্তি খাঁটি অন্তরে ও সৎ নিয়তে তার পথের সন্ধান করে, তিনি তার কাছে হেদায়াত ও তত্ত্বজ্ঞানের পথ সমূহ উন্মুক্ত করে দেন। যেমন তিনি নিজেই বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে চেষ্টা প্রচেষ্টা করে আমরা তাদের জন্য আমাদের পথ সমূহ উন্মুক্ত করে দেই। "আমাদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে" এ কথার অর্থ নিষ্ঠার সাথে এবং সৎ নিয়্যতে 'খোদার সন্তুষ্টি অর্জন' লক্ষ্য নির্ধারন করে। কিন্তু যদি কেউ খেল তামাশা ও ঠাট্টা বিদ্রুপের পথ অবলম্বন করে, সে-ই হতভাগ্য বঞ্চিত রয়ে যায়। সুতরাং এ পবিত্র নীতির উপর থেকে যদি তোমরা খাঁটি অন্তরে চেষ্টা কর এবং দোয়া করতে থাক, তবে তিনি অতীব ক্ষমাশীল পরম দয়াময়।

কিন্তু কেউ যদি আল্লাহ্ তাআলার পরোয়া না করে, তবে তিনিও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন। প্রত্যেক উদ্ধৃতিতেই কিছু না কিছু অতিরিক্ত কথা রয়েছে। এজন্য আমি এটি নিয়েছি। পূর্বেও উলেখ করা হয়েছে, কাউকে হেদায়াত দেয়া আল্লাহ্ তাআলার কাজ। আর হেদায়াত সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই পাওয়া যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার দাবী করে, যদি তার সত্যতার ব্যাপারে কারো সন্দেহ সংশয় থাকে এবং কোন ধরনের নিদর্শন দ্বারা সে সন্তুষ্ট হতে না পারে, তবে তার সত্যতা জানার জন্যও আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত প্রয়োজন। কিন্তু যদি তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপের বস্তু বানানো হয়, তবে মানুষ হেদায়াত লাভে বঞ্চিত থেকে যায়। শুধু বঞ্চিতই থাকে না, বরং আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক ধৃত হয়।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন, খোদা তাআলা তো সব মানুষকে ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের রঙে রঙ্গিন করতে চান। কেননা আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে তার নিজ প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। কুরআন করীমে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন,"সিবগাতাল্লাহে ওয়া মান আহসানু মিনাল্লাহে সিবগাতান ওয়া নাহনু লাহু আবিদুন"। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রং ধারন কর এবং রংয়ের দিক থেকে আল্লাহ্‌র চাইতে উত্তম আর কে হতে পারে? আর আমরা তার ইবাদত কারী। সুতরাং প্রত্যেক বিশ্বাসীকে আল্লাহ্ তাআলার রঙে রঙ্গীন হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। যাতে করে সে খোদা তাআলার সান্নিধ্য অর্জনের পথ পাড়ি দিতে পারে এবং নৈকট্য অর্জনের পথ দেখতে পায়। "সিবগাতাল্লাহে" এর অর্থ হচ্ছে ঐশী গুণাবলীর রং নিজের ভেতর সৃষ্টির চেষ্টা করা।

আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু স্বয়ং এ কথা বলেছেন, তাই এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা মানব প্রকৃতিতে এ যোগ্যতা ও সামর্থ রেখেছেন যে সে ঐশী গুণাবলী নিজের মধ্যে ধারন করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও বলেছিলেন, "আল্লাহ্ তাআলা আদমকে নিজ চেহারায় সৃষ্টি করেছেন"। এখানে চেহারা অর্থ আদম নিজের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী ধারণ করেছে এবং আদম অর্থ আদম সন্তান। অর্থাৎ সব মানুষের মধ্যেই আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলী রয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা সাত্তার (অতি গোপন), তাই মানুষকেও আল্লাহ্ তাআলার এ গুন থেকে অংশ নিয়ে সাত্তারী ও গোপনীয়তার গুণ অবলম্বন করা প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা শাকুর (প্রশংসা ভাজন), মানুষেরও প্রশংসা ভাজন হওয়া প্রয়োজন। যখন আল্লাহ্ তাআলা সম্বন্ধে শাকুর শব্দ আসে, তখন যদিও তার অর্থ ভিন্ন, কেননা আল্লাহ্ তাআলা সব ক্ষমতার অধিকারী। বান্দা কৃতজ্ঞ হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাকে এর বিনিময়ে মর্যাদা দেন। আল্লাহ্ তাআলার একটি অনেক বড় গুন তিনি সমগ্র বিশ্বের প্রভু প্রতিপালক। এটিকে সামনে রেখে প্রত্যেক মু'মিনও নিজ নিজ কর্তৃত্ব ও গন্ডীতে রব (প্রতিপালক)। পিতা মাতা তাদের সন্তানদের প্রতিপালন করেন। এক সীমিত পর্যায়ে তাদেরও প্রভুত্বের একটি গন্ডী রয়েছে। অনুরূপ ভাবে অন্যান্য গুণাবলীও রয়েছে।

সুতরাং এসব সুন্দর গুণাবলীকে সামনে রেখে যখন মানুষ প্রচেষ্টা করে, তখন আল্লাহ্ তাআলা তাকে সাহায্য করেন। আর যখন সে চেষ্টা করে, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে যেভাবে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা তার প্রচেষ্টায় প্রবৃদ্ধি দান করেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, খোদার সাথে মিলে খোদার সন্ধান কর। নিষ্ঠার সাথে খোদা সন্ধানের চেষ্টা করলে খোদা পেয়ে যাবে। খোদার সাথে মিলে খোদার সন্ধান করার অর্থ হচ্ছে তার গুনাবলী নিজের মধ্যে ধারণ কর। আল্লাহ্ তাআলা রহমান ও রহীম এবং তার রহমত প্রতিটি বস্তু পরিবেষ্টন করে আছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করে তার নামে অত্যাচার ও নিষ্ঠুর কর্মকান্ড সংঘটিত কারীরা কিভাবে আল্লাহ্ তাআলার পথ পেতে পারে। আজও ভীতিপ্রদ একটি সংবাদ এসেছে। মর্দানের মসজিদে জুমা চলাকালীন সময়ে সন্ত্রাসীরা হামলা করে। কিন্তু দায়িত্বরত খোদ্দামের তৃড়িৎ পদক্ষেপে সে বেশী ক্ষতি করতে পারেনি। সে কিছুই করতে পারে নি। ভেতরেই ঢুকতে পারেনি। সে গ্রেনেড প্রভৃতি নিক্ষেপ করে এবং নিজেই আত্মঘাতী হামলার শিকার হয়ে আহত হয়। আহত হবার পর সে বিস্ফোরন ঘটিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। এ কারনে মসজিদের গেট ও দেয়াল প্রভৃতি ধ্বসে পড়ে। সেখানে দায়িত্বরত এক জন খাদেম শহীদ হয় এবং কয়েকজন খাদেম আহতও হয়। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

আল্লাহ্ তাআলা এ শহীদকে মর্যাদায় উন্নীত করুন এবং বাকীদেরকেও আরোগ্য দান করুন। অন্যান্য হামলাকারীরা পালিয়ে যায়। যাই হোক, এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরা কেমন লোক যে ইসলামের নামে, খোদার নামে এসব কাজ করছে। যারা বলে কিনা আমরা খোদার গুণাবলী নিজেদের মধ্যে ধারনকারী। এসব লোক যারা আল্লাহ্‌র নামে আল্লাহ্‌র ইবাদতকারীদের উপর হামলা করে, এদেরতো কোন ভাবেই খোদার পক্ষাবলম্বনকারী বলা যায় না। দুদিন পূর্বে আমরা দেখেছি, শিয়াদের একটি শোভাযাত্রায় হামলা হয়েছে। সেখানে বিনা কারনে নিষ্পাপ কিছু প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে। বহু লোক আহতও হয়েছে। এসব লোকদের অন্তর আল্লাহ্ তাআলা এতটাই বক্র করে দিয়েছেন যে বাহ্যত মনে হচ্ছে এথেকে এদের ফেরার কোন পথ নেই। আর যারা এদের সাহায্য করছে ও প্রশ্রয় দিচ্ছে বা যাদের হাতে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এদের দমনের জন্য পুরোপুরি পদক্ষেপ নিচ্ছে না, তারাও এর জন্য দায়ী থাকবে। আল্লাহ্ তাআলা শীঘ্র এসব অত্যাচারীদের কবল থেকে দেশকে রক্ষা করুন। বরং পৃথিবীবাসীকে রক্ষা করুন। কারন এখনতো সমগ্র দুনিয়াতে এরা ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ তাআলাকে পাওয়ার জন্য প্রচেষ্টার অবস্থা সম্বন্ধে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এ উদাহরন দিয়েছেন, যারা চেষ্টা সাধনা করে তারা অবশেষে পথ লাভ করে।

যেমন চেষ্টা প্রচেষ্টা ও পানি সেচ ছাড়া রোপিত বীজ সমূহ বৃদ্ধি পায় না, বরং (বীজ) নিজেও বিনাশ হয়ে যায়। অনুরুপ ভাবে তোমরাও যদি এ অঙ্গীকার প্রতি দিন স্মরন না কর এবং এ দোয়া না কর, হে খোদা! আমাদের সাহায্য

কর, তবে আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য লাভ হবে না। আর আল্লাহ্ তাআলার সাহায্য ছাড়া পরিবর্তন অসম্ভব। সুতরাং যেভাবে বীজ চারায় রূপান্তরিত হওয়ার সময় নিজেকে বিনাশ করে চারায় রূপান্তরিত হয়, তেমনি তোমরাও যদি ফলবান বৃক্ষ হতে চাও তবে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে হবে। আর যদি আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাও, তবে নিজেকে বিলীন কর। এতেই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মধ্যেও এ অনুপ্রেরনা জারী থাকবে যারা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। সুতরাং এটি কোন সাময়িক প্রচেষ্টা নয়, বরং স্থায়ী প্রচেষ্টা যা এক বিশ্বাসীর জন্য ক্রমাগতভাবে চালিয়ে যাওয়া আবশ্যক। ঐ বীজের ন্যায় নিজেকে নাশ করা প্রয়োজন যা ফলবান বৃক্ষে পরিনত হয়। এবং তা তখন হবে যখন তোমরা এ যুগের ইমামের সাথে এবং খোদা তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকারকে সর্বদা দৃষ্টিতে রাখবে। "আমরা তাদের সাহায্য করি, তাদের পথ দেখাই, যারা ক্রমাগত প্রচেষ্টা করে"- আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতিকে যদি সর্বদা দৃষ্টিতে রাখ, তবেই সফল হতে পারবে। আর যদি এটিকে স্মরণ না রাখ, তবে সফল হতে পারবে না।

এক স্থানে তিনি এর ব্যাখ্যা করে বলেন, কুরআন করীমের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি, এক দিকে আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে নিজ করুনা, দয়া, কৃপা ও অনুগ্রহের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং তার রহমান হওয়া প্রমাণ করেন। আর অপর দিকে বলেছেন," ইন্না লাইসা লিল ইনসানে ইলা মা সাআ" এবং **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ খাঁটি অন্তরে চেষ্টা সাধনার মাধ্যমেই তাঁর কল্যাণ লাভ সম্ভব। এ ব্যাপারে সাহাবাদের (রা.) কর্ম কান্ড সমূহ আমাদের জন্য অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত এবং উত্তম নমুনা। সাহাবাদের (রা.) জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করে দেখ, তারা কি শুধু সাধারন নামাযের মাধ্যমেই সেই উচ্চ সম্মান লাভ করেছিলেন? না, বরং তারা তো আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের প্রানেরও মায়া করেন নি। ছাগল ভেড়ার ন্যায় খোদা তাআলার পথে কুরবান হয়েছেন। এ পর্যায়ে গিয়ে তারা এ উচ্চ সম্মান লাভ করেছেন।

অধিকাংশ লোককে দেখেছি তারা চায়, যেন এক ফুঁ-এর মাধ্যমে তাদের এই মর্যাদা দান করা হয় এবং তারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তিনি (আ.) আরো বলেন, আমাদের রাসূলুল্লাহ (সা.) এর চাইতে বড় আর কে হতে পারে! তিনি সর্বোত্তম মানব, সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল ও নবী ছিলেন। তিনিই যখন ফুঁ মেরে এ কাজ করেন নি, তবে আর কে এ কাজ করতে পারে। দেখো, তিনি হেরা গুহায় কিরূপ ধ্যান করেছিলেন। খোদা জানেন কত দীর্ঘ সময় ব্যাপী অনুনয় বিনয় ও কান্না কাটি করেছেন। পবিত্রতা অর্জনের জন্য কেমন চরম চেষ্টা সাধনা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তখন খোদা তাআলার পক্ষ থেকে কল্যাণ বর্ষিত হয়েছে। আসল কথা এটাই, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে নিজের উপর এক মৃত্যু এবং বিলীন অবস্থা আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেদিক থেকে (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যখন দেখেন কোন মানুষ নিজের পক্ষ থেকে পূর্ণ প্রচেষ্টা করছে এবং তাঁকে পাবার জন্য নিজের উপর মৃত্যু আনয়ন করেছে, তখন তিনি মানুষের উপর স্বয়ং প্রকাশিত হন এবং তাকে কল্যাণ দান করেন। ঐশী সাহায্য দ্বারা তার পদ মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

অন্য এক স্থানে তিনি (আ.) বলেছেন, খোদা তাআলার দিকে চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী কখনো ব্যর্থ হয় না। তাঁর (খোদা তাআলার) এটা সত্য প্রতিশ্রুতি রয়েছে, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** খোদা তাআলার পথের সন্ধানে যে নিয়োজিত সে পরিশেষে অভিষ্ঠ গন্তব্যে পৌঁছবে। জাগতিক পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণকারী, রাতকে দিন বানানোকারী ছাত্রদের পরিশ্রম ও করুন অবস্থা দেখে যেখানে আমাদের দয়া হয়, তবে অসীম ও অন্তহীন দয়াময় ও করুনাময় আল্লাহ্ তাআলা তাঁর নিজের দিকে আগত ব্যক্তিকে কিভাবে বিনষ্ট করতে পারেন? কক্ষনো না, কক্ষনো নয়। আল্লাহ্ তাআলা কারো প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেন না। অত:পর ঈমানী দৃঢ়তা অর্জন এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য অর্জনে সূক্ষ্ম যে পার্থক্য রয়েছে, এর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, বিশ্বাসীগণ পবিত্রাত্মার যে সাহায্য লাভ করে, তা শুধু মাত্র খোদা তাআলার পুরস্কার স্বরূপ হয়ে থাকে। কেবল সে-ই এটি পায় যে সত্যিকার হৃদয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং কুরআন শরীফের উপর ঈমান আনে। তা কোন চেষ্টা প্রচেষ্টা দ্বারা লাভ হয় না, শুধু মাত্র ঈমানের মাধ্যমেই লাভ হয় এবং বিনামূল্যে লাভ হয়। শর্ত কেবল এই, এমন ব্যক্তিকে খাঁটি ঈমানদার, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং পরীক্ষার সময় ধৈর্যশীল হতে হবে। কিন্তু খোদা তাআলার পক্ষ থেকে হেদায়াত যার উলেখ **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** আয়াতে রয়েছে, তা শুধু চেষ্টা সাধনা দ্বারা লাভ করা সম্ভব।

প্রথমত এটি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পথ) আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে লাভ হচ্ছে এবং এর জন্য বিশেষ চেষ্টা সাধনা করে তা অর্জন করতে হবে। চেষ্টা সাধনা কারী ব্যক্তির উদাহরণ অন্ধের ন্যায়। অধিক চেষ্টা সাধনা ছাড়াই সাধারন ঈমানী অবস্থাতো সে লাভ করে, কিন্তু তখনো তার অবস্থা অন্ধের ন্যায় হয়ে থাকে। তার আরো উন্নত মর্যাদা লাভ করার প্রয়োজন বাকী থাকে। তার দৃষ্টি লাভ করতে আরো দূরত্ব বাকী থাকে। কিন্তু পবিত্রাত্মার সাহায্য তাকে পূণ্যবান বানিয়ে দেয় এবং তাকে শক্তি দান করে এবং সে চেষ্টা সাধনার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সে যখন আল্লাহ্ তাআলার দিকে পৌঁছানর চেষ্টা সাধনা করতে থাকে, তখন সে পবিত্রাত্মা থেকে শক্তি লাভ করে এবং সে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যায়। আর চেষ্টা সাধনার পর মানুষ আরেক আত্মা লাভ করে যা পূর্বের আত্মা থেকে অনেক শক্তিশালী এবং প্রবল হয়ে থাকে। কিন্তু এই না যে এরা দুটি আত্মা, পবিত্রাত্মা একটাই। পার্থক্য কেবল শক্তির মানের। একই রুহ, একটিতে বেশী শক্তি, আরেকটিতে কম। প্রথম পর্যায়ে শক্তি কম ছিল, যখন দ্বিতীয় পর্যায় লাভ করে তখন অধিক শক্তি সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তাআলার ঐশী তত্ত্বজ্ঞান ও পরিচয় অধিক লাভ হয়। তার দিকে অগ্রসর হওয়ার নতুন নতুন পথের দিক নির্দেশনা লাভ হয়। যেমন খোদা দুজন নয়, বরং একজনই। কিন্তু সেই খোদাই বিশেষ জ্যোতির্বিকাশসহ এসব লোকদের সাহায্যকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে থাকেন এবং তাদের জন্য অলৌকিক নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করে থাকেন, তিনি অন্যদের এরূপ অলৌকিক নিদর্শন দেখান না।

এরপর তিনি বলেন, যে ব্যাক্তি খোদা তাআলার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, আল্লাহ্ তাআলাও তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন। হ্যাঁ, এটা আবশ্যক যে যতদূর সম্ভব সে নিজের পক্ষ থেকে চেষ্টায় কোনরূপে ত্রুটি করবে না। অত:পর তার প্রচেষ্টা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন সে খোদা তাআলার নূর দেখতে পাবে। **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** -এ আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত আছে, সে যেন তার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে, এমন যেন না হয় যেখানে বিশ হাত খনন করে পানি পাওয়া যাবে সেখানে সে দু হাত খনন করে হাল ছেড়ে দেয়। প্রত্যেক কাজের সফলতার চাবিকাঠি হচ্ছে হাল ছাড়া যাবে না। এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে যদি কেউ পূর্ণরূপে দোয়া ও পবিত্র অন্তর নিয়ে কাজ করে, তবে কুরআন মজীদের সব প্রতিশ্রুতি তার উপর পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, যে

বিরোধী কাজ করবে সে বঞ্চিত থাকবে। কেননা তার সত্ত্বা অতি লজ্জাশীল। তিনি তার নিজের দিকে আসার পথ অবশ্যই রেখেছেন, কিন্তু তার দরজা খুব সূক্ষ্ম ও সংকীর্ণ। সেখানে শুধু সে-ই পৌঁছতে পারে যে তিক্ত শরবত পান করে। লোকেরা পার্থিব চিন্তায় দুঃখ কষ্ট সহ্য করে। এমনকি অনেকে এতে ধ্বংশ হয়ে যায়।

কিন্তু তারা আল্লাহ্ তাআলার জন্য একটি কাঁটার আঘাত সহ্য করাও পছন্দ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি সততা, ধৈর্য এবং বিশ্বস্ততা প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে দয়া ও করুনা কিভাবে প্রকাশ পাবে? সুতরাং এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যে একজন বিশ্বাসীর কাজ হলো ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। তিনি (আ.) বলেছন, ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এটাই, ইসলাম সত্যিকার তত্ত্বজ্ঞান দান করে, যাতে মানুষের পাপ পঙ্কিল জীবনে মৃত্যু নেমে আসে, অত:পর তাকে এক নব জীবন দান করা হয় যা বেহেশতী জীবন হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু এটি নিশ্চিত বিষয়, তাহলে প্রত্যেক মানুষ কেন এটি দেখতে পায় না? এর উত্তর হচ্ছে, এটি আল্লাহ্ তাআলার বিধান যে চেষ্টা সাধনা, তওবা এবং পূর্ণ অভিনিবেশ ব্যতীত এটি লাভ করা সম্ভব নয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করবে, তারাই এই পথ লাভ করবে।

সুতরাং যারা আল্লাহ্‌র আদেশ ও বিধি-বিধান মান্য করবে না, বরং তা উপেক্ষা করবে, তাদের জন্য এ দরজা কিভাবে খুলবে? এটা হতে পারে না। অত:পর বলেন, এরা পবিত্রাত্মার শক্তিতে ভরপুর হয়ে এ চেষ্টা সাধনায় লেগে থাকে, অর্থাৎ সাহাবাদের ন্যায় সৎকাজের মাধ্যমে শয়তানের উপর বিজয়ী হয়। তখন তারা খোদা তাআলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এ চেষ্টা সাধনায় নিয়োজিত হয়, মানুষের পক্ষে যার চাইতে অধিক কল্পনা করাও অসম্ভব। তারা খোদার পথে নিজেদের প্রান খড়কুটার ন্যায় বিলিয়ে দিয়েছেন, (প্রাণ সমূহকে) খড়কুটার সমান মূল্যও দেন নি। অবশেষে তারা (খোদার কাছে) গৃহীত হয়েছেন এবং খোদা তাআলা তাদের অন্তর সমূহকে গুনাহর প্রতি বীতশ্রদ্ধ বানিয়েছেন এবং পূণ্যের প্রতি ভালবাসায় পূর্ণ করে দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করে, আমরা তাদেরকে আমাদের পথ প্রদর্শন করি। এ চেষ্টা সাধনার ফলেই সাহাবাগণ সেই মর্যাদা লাভ করেছিলেন, যার সম্বন্ধে হাদীসে এসেছে, হযরত ওমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স.) থেকে শুনেছি, হুযুর (সা.) বলেছেন, আমি আমার সাহাবাগনের ইখতেলাফ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি।

তখন আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রতি ওহী করেন, হে মুহাম্মদ (সা.) আমার নিকট তোমার সাহাবাদের এমন মর্যাদা রয়েছে যেমন আকাশে নক্ষত্র সমূহ রয়েছে। এদের একটি অন্যটির চাইতে উজ্জল। কিন্তু নূর সবার মধ্যেই বিদ্যমান। সুতরাং যে কেউ তোমার কোন সাহাবীর অনুসরন করবে, সে আমার নিকট হেদায়াত প্রাপ্ত হবে। হযরত উমর (রা.) এটাও বলেছেন, হুযূর (সা.) বলেছেন, আমার সাহাবাগন তারকা সদৃশ। তাদের মধ্যে যে কারো অনুসরন করলে তোমরা হেদায়াত পাবে। সুতরাং সাহাবাগণ (রা.) তাদের আত্মশুদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সাধনায় এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এরপর আল্লাহ্ তাআলা এ পুরস্কার দিয়েছেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেছেন, এ বয়আত গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে খোদা তাআলার প্রতি ভালবাসায় যেন আগ্রহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং গুনাহের প্রতি ঘৃনা জন্মিয়ে সেখানে যেন পূণ্য সৃষ্টি হয়। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যকে দৃষ্টিতে রাখে না এবং বয়আত গ্রহণের পর নিজের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন আনার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম করে না এবং সাধ্যানুযায়ী দোয়া করে না, তবে সে খোদা তাআলার সাথে কৃত এ অঙ্গিকারের তীব্র অসম্মান করে এবং সে সর্বাপেক্ষা বড় গুনাহগার এবং শাস্তিযোগ্য বলে গণ্য হয়। সুতরাং কখনো এটা ভাবা উচিৎ নয় যে বয়আতের এ অঙ্গীকারই আমাদের জন্য যথেষ্ঠ এবং আমাদের আর কোন প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই।

এর প্রসিদ্ধ উদাহরণ, যে ব্যাক্তি দরজায় কড়া নাড়ে, তার জন্য দরজা খোলা হয়। কুরআন শরীফেও বলা হয়েছে, **"ওয়াল্লাযীনা জাহাদু ফিনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা"** অর্থাৎ যারা আমাদের দিকে আসে, আমাদের জন্য চেষ্টা সাধনা করে, আমরা তাদের জন্য আমাদের পথ উন্মুক্ত করে দিই এবং তাকে সিরাতে মুস্তাকিমের উপর পরিচালিত করি। কিন্তু যে ব্যাক্তি চেষ্টাই করে না, সে কিভাবে এ পথ পেতে পারে। খোদা প্রাপ্তি, সত্যিকার সফলতা এবং মুক্তির রহস্য ও মূল চাবিকাঠি এটাই। মানুষের জন্য আবশ্যক যে সে খোদা তাআলার পথে চেষ্টা সাধনায় কখনো ক্লান্ত হবে না, অসহায় হবে না এবং তার পথে কোনরূপ দুর্বলতা দেখাবে না। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে তত্ত্বপূর্ণ এই কথা বুঝার ক্ষমতা দিন। সর্বদা আমাদের প্রচেষ্টা জারী রাখার এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করার এবং আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের পথে ধাবিত হওয়ার সৌভাগ্য দান করুন। আমাদের অঙ্গীকার পালনে দুর্বলতা দেখিয়ে এবং আমাদের প্রচেষ্টায় ঘাটতি করে আমাদের যেন খোদা তাআলার কাছে লজ্জিত হতে না হয়। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের নিজ অঙ্গীকার পালন করার এবং খোদা তাআলার সান্নিধ্য পাওয়ার সৌভাগ্য দান করতে থাকুন। আর বিশেষ ভাবে (রমযানের) বাকী দিন গুলো আমরা যেন পূর্বের চাইতে বেশী বেশী দোয়ায় অতিক্রম করতে পারি। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং যেন আমাদের ঢাল হয়ে যান এবং আমাদের শত্রুদের পরাস্ত করার উপকরন সৃষ্টি করুন।

যে শহীদের কথা আমি উলেখ করেছিলাম, প্রথমে আমার ধারনা ছিল হয়তো তার সংবাদাদী আসেনি, যানাযা পরবর্তী জুমুআয় হবে। কিন্তু যেহেতু সংবাদাদী এসে গেছে তাই জুমুআর নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ আমরা তার গায়বে যানাযা নামায পড়ব। শহীদের নাম শেখ আমের রেযা সাহেব, পিতা-মোকাররম মুশতাক আহমদ সাহেব। তার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ হিসেবে সেবা করছিলেন। এছাড়াও শহীদ কায়েদ মজলিশ এবং জেলা কায়েদ হিসেবেও সেবা দানের সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। তার নিজস্ব ইলেকট্রোনিক্সের ব্যবসা ছিল। তিনি ভেতরে ছিলেন। সেখানে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তা এত তীব্র ছিল যে দেয়াল ভেতর দিকে ভেঙ্গে পড়ে এবং দরজাও ভেতর দিকে ভেঙ্গে পড়ে। এজন্য তিনি ভীষন আহত হন।

হাসপাতালে নেয়ার পথে রাস্তায় শহীদ হন। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রমী আহমদী ছিলেন। তার পরিবার বর্গের মধ্যে তার স্ত্রী লুবনা আমের সাহেবা এবং এক ছেলে উসামা আমের, বয়স নয় বছর এবং দেড় বছরের একটি শিশু সন্তান আছে। দাফনের জন্য ইনশাআল্লাহ্ তার জানাযা রাবওয়াহ্ নিয়ে যাওয়া হবে। জুমুআর নামাযের পর আমরা তার জানাযা গায়েব আদায় করব।

অনুবাদ : **মওলানা শরীফ আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ
[পূণর্মুদ্রিত]

ঈদুল ফিতরের খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ প্রদত্ত ঈদুল ফিতরের খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক।

নাম-সর্বস্ব মৌলবীরা আশা করুক আর না-ই করুক ইসলামের সজীবতার যুগ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ও তাঁর (আ.) জামা'তের সাথে সুসংবদ্ধ।

পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে।

যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করার মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে।

তাশাহ্হুদ, তাঊজ, তাসমিয়া ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন-

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

(আল-ইনশেরাহ:৬-৭)

অর্থ: অতএব (জেনে রাখ) নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে। আমি যে আয়াত দুটি পাঠ করলাম এগুলো সূরা আল-ইনশেরাহ্ এর। অনেকেরই এটি মুখস্ত আছে। এ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল। আমরা সবাই জানি মক্কায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে দীর্ঘ তের বছর অবর্ননীয় অত্যাচার, নির্যাতন ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। দরিদ্র সাহাবীদের উপর যে নির্যাতন চলত তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে সর্বদা ধৈর্য ধারনের উপদেশ দিতেন এবং তাদের জন্য দোয়া করতেন। হযরত ইয়াসের (রা.) ও তার পরিবারের উপর নির্যাতনের এমনই একটি ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাদের উপর নির্যাতন চলছিল, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ নির্যাতন দেখে বললেন, **"সাবরান আ-লা ইয়াসের ফাইন্না মাওয়েদাকুমুল জান্নাত"** (মুসতাদরেক, খন্ড-৪, কিতাব-মা'রেফাতুস্ সাহাবাহ্ যিকরু মানাকেবে আম্মার বিন ইয়াসের পৃ-৯৯, হাদীস-৫৭৩২) অর্থাৎ হে ইয়াসেরের পরিবার! ধৈর্য ধারন কর। এসব কষ্টের বিনিময়ে খোদা তাআলা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করছেন বা তোমাদের জন্য জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন।

এরপর এ নির্যাতনের মধ্যেই এ দু'জন স্বামী-স্ত্রী শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেন। লক্ষ্য করুন, নির্যাতন এত তীব্র ছিল যে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু এ থেকে মুক্তি দিতে পারত না। মুক্তির কোন পথ দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। অন্যদিকে ধৈর্য ধারনের উপদেশ দেয়া হচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে এ সুসংবাদও দেয়া হচ্ছিল যে,'সব দুঃখ-কষ্টের পরই এক মহা সাফল্য নির্ধারিত আছে। এবং নিশ্চয় সব দুঃখ-কষ্টের পর আরেকটি বিজয় নির্ধারিত আছে।' দুঃখ-কষ্ট, প্রাণের কুরবানী এবং নির্যাতনের সংকটময় এ অবস্থা তো আছে। কিন্তু এই এক একটি নির্যাতনের বিপরীতে বিজয়ের একটি ধারা আরম্ভ হবে। এরপর বিশ্ববাসী দেখেছে, এসব দুর্বল, অসহায় ও নির্যাতীতগণ শুধু সমগ্র আরবেই বিজয়ী হয়নি, বরং আরবের গন্ডি পেরিয়ে বড় বড় রাজত্বকে পরাজিত করে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কর্তৃত্বে নিয়ে আসে এবং

কয়েক শতাব্দী ধরে মুসলমানগণ বিশ্বের বুকে এক বৃহৎ শক্তি রূপে বিরাজমান থাকে। আজ মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর দাসত্বে গর্ব অনুভব করে। নিঃসন্দেহে এটি গর্ব করারই যোগ্য। আজ ভূ-পৃষ্ঠে এরচেয়ে বড় পুরস্কার আর কিছুই নেই যে আমরা শেষ যুগের নবী এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর দাসদের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু কুরআনের এ আয়াত যেমন ঘোষনা করে যে কষ্টের যুগও আসে। তাই কষ্টের যুগ আসবে এবং এসেছেও। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, আমার উম্মতের উপর একটি অন্ধকার যুগ আসবে যখন তাদের সেই সম্মান, গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকবে না যা একবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ আমরা দেখছি, কত সুস্পষ্টভাবে এ ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। যদিও ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু তারা তাদের মর্যাদা ও গৌরব হারিয়ে বসেছে।

আজ তারা প্রতিটি জিনিষের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী। আমাদের নিজেদের সম্পদও এখন অন্যের দখলে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে আমরা তেল উত্তোলন করতে বা কোন প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে লাভবান হতে সক্ষম হতে পারছি না। এ হচ্ছে পার্থিব অবস্থা। আর ধর্মের অবস্থা কি? নামধারী আলেমগণ ধর্মকে বিকৃত করে এতে বিদাত (নতুনত্ব) সৃষ্টি করেছে। আজ সেই ইসলাম নেই যা রাসূলুলাহ (সা.) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সেই ইসলাম যা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিয়ে এসেছিলেন এবং এ ইসলাম যা বর্তমান নামধারী আলেমগণ পেশ করছেন, এ উভয়ের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য। ঈমানের আবেগ অবশ্য প্রকাশ করা হয়, কিন্তু আমল (বাস্তবায়ন) থেকে তা বহু দূরে। জিহাদের অপব্যাখ্যা করে ইসলামের দুর্নাম করার চেষ্টা চলছে। কথিত জিহাদের অস্ত্রাদীর জন্যও মুসলমানগন আবার সেই অমুসলিমদেরই মুখাপেক্ষী।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ বিষয়ে এক স্থানে বলেছেন,'আল্লাহ্ তাআলা যদি এ যুগে অস্ত্রের জিহাদ বা যুদ্ধের অনুমতি দিতেন, তবে মুসলমানদেরকে অস্ত্রের জন্য অন্যের মুখাপেক্ষী করতেন না।' (মলফুযাত, খন্ড-৩, পৃ-১৯০)

অতএব, বর্তমানে অমুসলিমগণ যেহেতু সাধারনত ধর্মের নামে যুদ্ধ করছে না, তাই এখন যদি ধর্মের নামে অস্ত্র ধারন কর তবে পরাজিত হবে। শুধু তাই নয়, জিহাদ এবং ইসলামের নামে জিহাদের এমন অপব্যবহার করা হচ্ছে যে নির্যাতন ও বর্বরতার উপাখ্যান রচিত হচ্ছে। ইসলাম সেই অতুলনীয় ধর্ম যা প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতিও শুধু এজন্য পেয়েছিল যে কাফেরদের যদি তখন প্রতিহত করা না হতো তবে কোন গির্জাও নিরাপদ থাকবে না। ইহুদীদের কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। অন্য কোন উপাসনালয়ও নিরাপদ থাকবে না। মসজিদ সমূহও নিরাপদ থাকবে না। কিন্তু এরা এমন জিহাদী যারা খোদার নামে খোদারই ঘরে নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ইতিহাস রচনা করছে। নির্দ্বিধায় তারা কলেমা পাঠকারীদের হত্যা করে চলেছে। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যুদ্ধচলাকালীন সময়েও কোন বৃদ্ধকে হত্যা করবে না, কোন নারীকে হত্যা করবে না, কোন শিশুকে হত্যা করবে না, পাদ্রী ও ধর্মযাজকগণ যারা নিজেদের উপাসনালয়ে ইবাদতে মগ্ন এবং উপদেশ দানরত, তাদের কোন ক্ষতি করবে না। জাতীয় সম্পদ, বৃক্ষ প্রভৃতি বিনষ্ট করবে না। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, বাব-ফী দোয়াইল মুশরিকীন, হাদীস ২৬১৩-২৬১৪, মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, মুয়াত্তা ইমাম মালেক)

কিন্তু বর্তমান যুগের জিহাদীগণ তো স্বজাতি ও কলেমা পাঠকারী লোকদের সাথে এমন পাশবিক ও নিষ্ঠুর আচরন করছে যা দর্শনে ও শ্রবনে শরীরের লোম দাড়িয়ে যায়। তাও আবার খোদা ও রাসূল (সা.) এর নামে তারা এসব করছে। নিশ্চয় এহেন কর্মের জন্য তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অসন্তুষ্টি অর্জন করে ধৃত হবে এবং হচ্ছেও। কেবল জঙ্গী সংগঠনগুলোই নয় যাদের সাধারনত সর্বত্রই ধীক্কার জানানো হয়, বরং আহমদীদের উপর এ ধরনের নির্যাতন অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে আহমদী-বিরোধী আলেমগণও অনুমতি দিয়ে থাকে। শুধু আলেমগণই নয়, কিছু রাষ্ট্রও এ নির্যাতনের সাথে জড়িত। তারা অত্যাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে।

এটা কি সেই কষ্টের যুগ, যে সম্পর্কে খোদা তাআলা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কে অবগত করেছিলেন যে আজ মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন হচ্ছে, ক্ষমতা লাভের পর মুসলমানগণ নিজেরাই কাল নির্যাতন করায় লিপ্ত হবে? কক্ষনো নয়, কক্ষনো না। যেমন আমি বলেছি, সেই মক্কার যুগ কষ্টের ছিল যার পর আল্লাহ্ তাআলা স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিলেন। এর এক যুগ পর পুনরায় কষ্টের যুগ এসেছে, যার পর আল্লাহ্ তাআলা পুণরায় স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সেই স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ ধর্মীয় উন্নতির ভিত্তিতে প্রতিশ্রুত মসীহের আগমনের পর আরম্ভ হবার ছিল এবং সেটি হয়েছেও। কিন্তু যারা প্রতিশ্রুত মসীহকে মান্য করেনি তারা এখনো অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে এবং মসীহ্ মাওউদকে মান্যকারীদের কষ্টে জর্জরিত করার চেষ্টা করছে। তারা দিনরাত এ চেষ্টায় লিপ্ত যে কিভাবে এবং কোন পদ্ধতিতে তাদেরকে কষ্ট দেয়া যায়। উম্মতের জন্য এরচেয়ে বড় দুঃখজনক আর কি হতে পারে যে, যে অন্ধকার থেকে নিস্কৃতি এবং মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আল্লাহ্ তাআলা মসীহ্ মাওউদ কে প্রেরন করেছেন, মুসলমানগণ সেই মসীহ্ মাওউদ এর জামা'তের উপর অত্যাচার চালিয়ে নিজেদের কষ্টের যুগ দীর্ঘায়িত করে চলেছে। আহমদীয়াত বিরোধীরা মনে করে যে তারা আহমদীদের কষ্টে নিপতিত করছে।

আহমদীদেরকে তো আল্লাহ্ তাআলা তার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব কষ্টকর অবস্থার পর বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে যাচ্ছেন। বিরোধীরা তাদের ধারনায় আহমদীয়াতকে ধ্বংশ করার জন্য যেসব বিরোধীতা, অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা চালাচ্ছে, এসব প্রতিটি বিরোধিতার পর জামাত উন্নতির উচ্চতর সিড়িতে পা রাখছে, আর বিরোধীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলা কোন না কোন ভাবে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তবুও লোকেরা বুঝতে পারছে না এবং নামসর্বস্ব ধর্মীয় পোষাকধারীদের হাতের খেলনা হয়ে চলেছে। মুসলমান জনসাধারনের মধ্যে কেউই নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে সত্য গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, 'খোদা তাআলা আমাদের বিরোধী আলেমদের অবস্থার উপর করুণা করুন। তারা যেসব কাজ করছে তা ধর্মের জন্য ভাল নয়, বরং অত্যন্ত ভয়ানক। তারা সেই সময়কে ভূলে গেছে যখন তারা মিম্বরে চড়ে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে একের পর এক ধীক্কার জানাত এজন্য যে, এ শতাব্দীতে ইসলামের ভীষন ক্ষতি হয়েছে। তারা কুরআনের আয়াত **"ফা ইন্না মাআল উসরে ইউসরা,**

ইন্না মাআল উসরে ইউসরা” পাঠ করে এর মাধ্যমে দলিল পেশ করত যে কষ্টের এ শতাব্দীর বিপরীতে চতুর্দশ শতাব্দী আসবে স্বাচ্ছন্দ্যের । কিন্তু অপেক্ষা করতে করতে চতুর্দশ শতাব্দী যখন এসে গেল এবং শতাব্দীর ঠিক শিরোভাগে খোদা তাআলার পক্ষ থেকে মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীদার এক ব্যক্তির আবির্ভাব হল। তার সমর্থনে নিদর্শন প্রকাশিত হল । পৃথিবী ও আকাশ তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিল, তখন এসব আলেমগণই সর্বপ্রথম তাঁকে অস্বীকার করল।” (তোহফায়ে গোলড়বিয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৩২৭, পাদটীকা)

অতএব, আলেমদের আচরন ও রীতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে। এখন তারা এটিও বলতে শুরু করেছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ আসার প্রয়োজনই নেই। নেতা রূপে আমরাই যথেষ্ট অর্থাৎ এসব নামধারী ওলামা। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা যাকে পথ-প্রদর্শক বানান সে-ই প্রকৃত পথ-প্রদর্শক। স্বঘোষিত পথ-প্রদর্শকগণ প্রকৃত পথ-প্রদর্শক নয়। নয়তো যাদের শুধু পার্থিব জ্ঞান রয়েছে, তাদের অজ্ঞতা প্রসূত কথা-বার্তা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় যে এতে ঐশী নেতৃত্বের নূরের ছিটে ফোটাও নেই। সম্প্রতি একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। একজন বড় স্কলার (বিজ্ঞ ব্যক্তি) বলে কথিত যার ডক্টরেট ডিগ্রীও রয়েছে এবং তাকে ডক্টর-ই বলা হয়।

তিনি পাকিস্তানের ফেডারেল মন্ত্রী এবং ইসলামী চিন্তাধারা কাউন্সিলের সদস্যও ছিলেন। তার সম্পর্কে সংবাদপত্রে একটি সংবাদ এসেছে। তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন যে, প্রেসিডেন্ট ওবামা যদি গ্রাউন্ড জিরোতে মুসলমানদের সাথে দুই রাকাত ঈদের নামায আদায় করেন, কেননা বর্তমানে গ্রাউন্ড জিরোর যে controversy রয়েছে, যে বড় সমস্যা চলছে, তবে মুসলিম উম্মাহ্ তাকে খলীফাতুল মুসলেমীন এবং আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মেনে নিবে। যে চিন্তা করে বা যে হিসাব বা অংক কষেই তিনি এ বিবৃতি দিয়ে থাকুন, তার বুদ্ধি বিবেচনায় আশ্চর্য্য হতে হয়। এসব মুমিনদের অন্তর্দৃষ্টির এ-কী হাল? এসব মুমিনদের ‘খলীফাতুল মুসলেমীন’ এমনই হওয়া প্রয়োজন। আমীরুল মু’মিনীন ও খলীফাতুল মুসলেমীনের জন্য তারা এটি, কি মানদন্ড নির্ধারন করেছে? কোন ধরনের মানদন্ডের ভিত্তিতে তারা তা বানাতে চায়? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে না মানার কারণে তাদের চোখও প্রত্যেক বিষয় পার্থিব দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে । এ কথার মাধ্যমে অনুমান করা যায়, অন্ধকার কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এরপরও তারা বলে, আমাদের এখন কোন মসীহ্ ও মাহ্দীর প্রয়োজন নেই। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাদের উপর দয়া করুন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে বলেছেন,‘ইসলাম বড় বড় বিপদের দিন অতিক্রম করেছে। এখন এর হেমন্ত পার হয়ে বসন্তকাল চলছে। ‘ইন্না মাআল উসরে ইউসরা’ অর্থাৎ কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য আসে। কিন্তু মোলাগণ চায়না যে এখন ইসলাম পুনরায় সজীব ও প্রাণবন্ত হোক।’ (মলফুযাত, খন্ড-৫, পৃ-১৬৫)

অতএব, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের মাধ্যমে ইসলামের কষ্টের যুগ শেষ হয়েছে। যুগের মসীহ্ ইসলামের অতুলনীয় শিক্ষাকে উজ্জ্বলভাবে বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছেন। অভ্যন্তরীণ ও বহির্শত্রুদের সৃষ্ট সর্ব প্রকার বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আহমদীয়াতের কাফেলা সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হচ্ছেন। মুসলমানদের মধ্যেও সৎ প্রকৃতির লোকগণ যুগ ইমামের হাতে সমবেত হয়ে সেই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ধারন করছেন যা দল উপদলের বিভক্তি থেকে মুক্ত প্রথম যুগের মুসলমানগণ অবলম্বন করেছিলেন, যেটি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা। এসব আহমদী মুসলমান সেই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করছেন যার আমলী (বাস্তব) উদাহরণ সাহাবীগণ (রা.) আমাদের সামনে পেশ করেছিলেন। যারা অনেক কুরবানী করেছিলেন, প্রাণের কুরবানী পেশ করেছিলেন এবং ইসলামের পতাকাকে সমুন্নত রেখেছিলেন। যারা ইবাদতের উচ্চমান প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছিলেন এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নির্দ্বিধায় সম্পদ কুরবানী করেছিলেন। যারা খোদা ও তাঁর রাসূল (সা.)-এর জন্য বন্দীত্বের কষ্ট বরণ করেছিলেন।

আজ শুধুমাত্র আহমদীগণই এ নমুনার বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করছে। যারা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা সমুন্নত করার জন্য সর্বপ্রকার কুরবানী করতে কেবল প্রস্তুতই নয়, বরং করেও যাচ্ছেন। আমরা এ দৃষ্টান্ত ঐ সব মুসলমান রাষ্ট্রে দেখতে পাই যেখানে আহমদীয়াত বিরোধীরা ইসলামের নামে লোকদের হৃদয়ে আহমদীয়াত সম্পর্কে বিষ ঢালছে। আবার কিছু রাষ্ট্র রয়েছে যারা তাদের কিছু অসৎ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য এসব দুস্কৃতিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কিন্তু এসব কষ্ট আহমদীদের ঐসব কুরবানীর কথা স্বরণ করিয়ে দেয় যা প্রথম যুগের মুসলমানগণ পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগেও কষ্ট ছিল, আবার স্বাচ্ছন্দ্যের ভবিষ্যদ্বাণীও ছিল। বিশ্ববাসী এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখেছে। মদীনা এসেও সেই কষ্টের যুগ শেষ হয়নি। বিরোধিতা ও ফিতনা শেষ হয়ে যায় নি। মুসলমানদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রতারনা করে শহীদ করা হয়। বি'রে মাউনার বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে যখন ধোকা দিয়ে একটি গোত্র সত্তর জন হাফেজে কুরআনকে শহীদ করে। রজী নামে একটি ঘটনা বিখ্যাত। এতেও ধোকা দিয়ে দশ জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়। বর্ণনা অনুযায়ী এ দুটি ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একই সময়ে জানতে পারেন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৪৭৬) এতে তিনি (সা.) খুবই দুঃখিত হন। (শরহে আলামা যুরকানী আলাল মুয়াহেবুলাহ্, খন্ড-২, পৃ-৫০৩)।

বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ত্রিশ দিন পর্যন্ত এসব যালেমদের বিরুদ্ধে ফজরের নামাযে দাড়িয়ে এ দোয়া করতেন,‘হে আমার প্রভু! তুমি এ অবস্থায় আমাদের প্রতি করুণা কর এবং ইসলামের শত্রুদের হাত প্রতিহত কর যারা তোমার ধর্মকে ধ্বংশের জন্য নির্দয় ও নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পাপ মুসলমানদের রক্তপাত করে চলছে। (সীরাতে খাতামান্নাবিঈন, পৃ-৫২১) অতএব, কষ্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যের যুগ একই সাথে চলতে থাকে। একদিকে মুসলমানদের রক্ত বইতে থাকে, অন্যদিকে নবাগতদের মাধ্যমে ইসলাম শক্তিশালী হতে থাকে। প্রত্যেক কষ্টের পর মুসলমানগণ একটি বড় বিজয় লাভ করতে থাকেন। এখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এর সত্য প্রেমিকরূপে তাঁর (সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও এ প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন এ প্রতিশ্রুতি নিয়েই এসেছে। সব কষ্টের পর বিজয় অবধারিত হবার যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তাআলা দু'বার দিয়েছেন তা এজন্য যে, যে দৃশ্য প্রথম যুগের মুসলমানগণ দেখেছিলেন তা তাঁর

(সা.) দ্বিতীয় আগমনের সময়ও প্রকাশিত হবে। নামধারী মৌলভীগণ প্রত্যাশা করুক বা না করুক, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর জামা'তের জন্য ইসলামের জীবন্ত ও সতেজতার যুগ নির্ধারিত আছে। শত্রুদের পক্ষ থেকে কষ্ট যেমন দেয়া হচ্ছে, তেমনি বিজয়ও পূর্বের চাইতে অধিক মর্যাদায় প্রকাশিত হচ্ছে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর সাথেও আল্লাহ্ তাআলা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ইলহামের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যখন তিনি বয়আত নেয়া শুরু করেন নি, এমনকি মসীহ্ মাওউদ হবার দাবীও করেন নি। আল্লাহ্ তাআলা তখন তাকে বলেছেন,' বা'দাল উসরে ইউসরা' অর্থাৎ 'কষ্টতো আছে কিন্ত তা অল্প, এরপর স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয় নির্ধারিত আছে'। ব্যাখ্যামূলক এ অনুবাদ আমি এজন্য করেছি যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন, আরবী ভাষাবিদদের মতে **'আল-উসর্'** শব্দ ব্যবহার করে কষ্টকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং **'ইউসর'** কে এ সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত রেখে প্রশস্ততা দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ দুঃখ কষ্ট রয়েছে, কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে, কিন্তু প্রত্যেক কাঠিন্য, প্রত্যেক কষ্ট অগনিত বিজয় নিয়ে আসবে এবং এটিই ঐশী জামা'তের বৈশিষ্ট্য। এ দ্বীনকে আল্লাহ্ তাআলা কেয়ামত পর্যন্ত মর্যাদা ও গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আবার সব নিদর্শনও আমরা পূর্ণ হতে দেখছি। ক্রমাগত উন্নতিও হচ্ছে। তবে আমরা এ বিষয়ে কেন দৃঢ় বিশ্বাসী হব না যে বিরোধী ও আলেমগণের বিরোধিতা আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। ব্যক্তি-বিশেষের প্রাণ কুরবানীর ফলে জাতি ধ্বংশ হয় না, বরং উৎসাহ-উদ্দীপনা ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে যখন কুরবানী করার অঙ্গীকার করা হয় এবং প্রাণ কুরবান করা হয়, তখন তা জাতি ও জামা'তের আয়ু দীর্ঘায়িত করে। তার শক্তি বৃদ্ধি করে। আর খোদা তাআলার প্রতিশ্রুতি যখন এসব কুরবানী এবং দৃঢ় সংকল্পকে উজ্জ্বলতর করে ঈমানকে দৃঢ় করতে থাকে, তখন কুরবানী ও কষ্ট সমূহ একেবারেই নগন্য মনে হয় এবং এক নতুন মর্যাদার সাথে উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কেও আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। দাবীর বহু পূর্বেই খোদা তাআলা তাকে সান্তনা দিয়েছেন এবং সান্তনা দিতে থেকেছেন যে আমি তোমাকে যে কাজের উদ্দেশ্যে দাঁড় করাচ্ছি, তা যত কঠিন কাজই হোক, আমি তোমার সাথে আছি এবং তুমি সাফল্য ও বিজয় দেখতে পাবে। একবার এ আয়াতের মাধ্যমে ইলহামরূপেও তাঁকে বলেন, **"ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম্ মুবীনা লেইয়াগফিরা লাকালাহু মা তাকাদ্দামা মিন যাম্বেকা ওয়ামা তাআখ্খারা।"** বারাহীনে আহমদীয়াতে এর ব্যাখ্যা করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন,'আমি তোমাকে প্রকাশ্য বিজয় দান করেছি, অর্থাৎ দান করব এবং মাঝে যেসব কষ্ট কাঠিন্য ও বিপদাবলী রয়েছে, সেগুলো এ উদ্দেশ্যে যেন খোদা তাআলা তোমার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ্ ক্ষমা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা এবিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান, তিনি চাইলে কোন ধরনের দুঃখ কষ্ট ছাড়াই মূল লক্ষ্য অর্জিত হয়ে যেত এবং খুব সহজেই মহা বিজয় লাভ হত। কিন্তু দুঃখ কষ্ট এজন্য যে এগুলো উন্নতি এবং গুনাহ্ সমূহ ক্ষমার উপায় স্বরুপ।

তিনি (আ.) আরো বলেন,'আজ এ প্রেক্ষিতে এ অধম যখন শুদ্ধকরনের উদ্দেশ্যে খাতা দেখছিলাম (যখন বারাহীনে আহমদীয়া লিখছিলেন) তখন কাশ্‌ফী অবস্থায় কয়েকটি পৃষ্ঠা আমার হাতে দেয়া হয় এবং তাতে লেখা ছিল, **'বিজয়ের ডঙ্কা বাজে'**। এরপর একজন মৃদু হেসে সেই পৃষ্ঠাগুলোর বিপরীত দিকে একটি ছবি দেখিয়ে বলল, দেখ তোমার ছবি কি বলে। আমি দেখলাম, সেটি এ অধমের ছবি। ছবিতে অধমের পোষাক ছিল সবুজ এবং অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় খুব প্রতাপশালী লাগছিল। ছবির ডান ও বাম দিকে **"হুজ্জাতুলাহুল কাদির ওয়া সুলতান আহমদ মুখতার"** লেখা ছিল।' (বারাহীনে আহমদীয়া, রুহানী খাযায়েন, খন্ড-১, পৃ-৬১৫)

অতএব, এ সুসংবাদের আলোকে আমাদের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই যে আহমদীয়াত বিরোধীদের পক্ষ থেকে আমাদের যেসব কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা হয় বা অত্যাচারের লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, এগুলোর দ্বারা জামা'তে আহমদীয়ার কোন ক্ষতি হবে না। শত্রুদের ষড়যন্ত্র সমূহ ব্যর্থ হওয়া, তারা যে লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তা অর্জিত না হওয়া, এটি বিজয়ের চিহ্ন এবং বিজয়ের দিকে ধাবিত হবার লক্ষণাবলী প্রদর্শন করছে। কিন্তু বিজয়ের ডঙ্কা কি? সেটি হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে এক মহা বিজয় হবে এবং সমগ্র বিশ্ববাসী সেটি দর্শন করবে। সেটি বাজবে, অবশ্যই বাজবে। শত্রুরা, যারা সময়ে সময়ে আহমদীদের কষ্ট দেয়, তা মিশরেই হোক বা ইন্দোনেশিয়াতে, মালেয়শিয়াতে হোক বা শ্রীলঙ্কাতে, হিন্দুস্তানে হোক বা বাংলাদেশে বা পাকিস্তানে। সম্প্রতি বাংলাদেশে আমাদের একটি ছোট জামাত যা বহু দূরের একটি উপজেলায় অবস্থিত, যার নাম চাঁনতারা, সেখানে মসজিদ সম্প্রসারনের কাজ চলছিল।

মসজিদ নির্মান চলাকালীন সময়ে এসব দাঙ্গাবাজ যাদের মধ্যে মৌলভীরাও ছিল, আক্রমন চালিয়ে লোকজনদের শুধু আহতই করেনি, বরং মসজিদও ভেঙে ফেলেছে। আহমদীদের ঘরবাড়ীও ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। তারা এসব দরিদ্রদের জিনিষপত্র জ্বালিয়ে দেয়। পুরুষদের গুরুতর আহত করে। জামাতী কেন্দ্র ঢাকা থেকে আমাদের প্রতিনিধি যখন সেখানে যায় এবং নারীদেরকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞেস করে, নারীরা সাধারনত দুর্বল প্রকৃতির হয়ে থাকে, কিন্তু এক নারী হেসে বলে, এরা আমাদের যতই ক্ষতি করুক, আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে পারবে না। এ নারী এ কষ্টে কেঁদেও ছিল যে আমরা এখন মসজিদ নির্মান করতে পারব না। আমাদের কাজ কিছুটা থেমে গেছে। আর পাকিস্তানে তো নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতার ঐ ইহিতাস রচিত হচ্ছে যে মনে হয় এদের খোদা তাআলার শক্তি ও ক্ষমতার প্রতি সামান্যতম বিশ্বাসও নেই। যদি বিশ্বাস থাকত তবে খোদা তাআলার নামে এ নির্যাতন অব্যাহত রাখত না। গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত নিরানব্বই জনকে শহীদ করা হয়েছে। যালেমরা তো একদিনেই ছিয়াশি জনকে শহীদ করেছে। এসব যালেমদের দৃষ্টিতে আহমদীদের রক্ত এতই সস্তা যেন এর কোন মূল্যই নেই। তাদের ধারনায় নাউযুবিলাহ্ খোদা তাআলাও এ রক্তপাতের ব্যাপারে উদাসীন।

কিন্তু এসব রক্তপাতকারীদের স্বরণ রাখা প্রয়োজন, আল্লাহ্ তাআলা এসব যালেমদের

কাছ থেকে রক্তের প্রতিটি বিন্দুর হিসাব নিবেন, অবশ্যই নিবেন। এবং এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু কবুল করে এমন ভাবে পুরস্কৃত করবেন এবং পুরস্কৃত করেও যাচ্ছেন যে এটি আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী **'ফাতহাম্ মুবীনা'** অর্থাৎ মহা বিজয়ের নিকটতর করছে। লাহোরের ঘটনার পর বিশ্বব্যাপী আহমদীয়া জামা'তের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, পরিচিতি হয়তো পূর্বেও ছিল কিন্তু দৃষ্টি ছিল না, জামা'তের প্রতি যে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, সেই দৃষ্টি আকর্ষন ও পরিচিতির জন্য আমরা যদি পূর্বে আমাদের উপকরনাদীর মাধ্যমে চেষ্টা করতাম, তবে সম্ভবত কয়েক দশক লেগে যেত। আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ শহীদগণ শাহাদতের মর্যাদা লাভ করে কেবল পরজগতে চিরজীবন লাভ করেননি, বরং তাদের প্রাণ কুরবাণী করে এ জগতেও হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণী পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে গেছেন। বাণীতো আল্লাহ্ তাআলা পৌঁছাবেন। পৌঁছিয়ে যাচ্ছেন এবং পৌঁছিয়ে যাবেন। কিন্তু মাধ্যম আল্লাহ্ তাআলা বানান। এসব শহীদগণকে এ বাণী পৌঁছানোর একটি খুব শক্তিশালী মাধ্যম বানিয়েছেন তিঁনি। অতএব, এসব কুরবানীকারীগণ খুব সৌভাগ্যবান।

সম্প্রতি পাকিস্তানে কয়েক ডজন অ-আহমদী এবং অন্য ধর্মাবলম্বী লোক সন্ত্রাসীদের যুলুমের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে। অনেক নিস্পাপ প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, শিশুরা এতীম হচ্ছে, নারীরা বিধবা হচ্ছে, বৃদ্ধ পিতামাতা যুবক সন্তানদের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কিন্তু এসব নিহতরা জানেনা যে কেন তাদের হত্যা করা হয়েছে? তাদের আত্মীয়-স্বজনরাও জানেনা যে আমাদের প্রিয়দের কেন হত্যা করা হয়েছে এবং কেন হত্যা করা হচ্ছে? কিন্তু পাকিস্তানে আহমদীগণ তাদের প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে দিনাতিপাত করছে। তারা জানে যে তাদের প্রাণ যদি যায় তবে এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য যাবে।

শহীদদের পরিবারবর্গ, সন্তান, বিধবা স্ত্রীগণ, পিতামাতাগণ জানেন যে আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী দিয়েছেন তা এক মহান উদ্দেশ্যের জন্য দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। প্রাণের কুরবানী পেশ করে তারা যেমন তাদের প্রাণ চিরস্থায়ী করে নিয়েছেন, তেমনি তারা পেছনে যাদের রেখে গেছেন তাদের মাথা গর্বে উঁচু করে গেছেন। এ বিষয়ে আমার কাছে বেশ কিছু চিঠি এসেছে, আসে এবং প্রায়ই আসছে। তারা লিখেছেন, আমরা তো জানতামই না যে আমাদের প্রিয়গণ আমাদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাদের মর্যাদা কত বাড়িয়ে গেছে। এটি তো ব্যক্তিগত লাভ, কিন্তু জামা'তের যে লাভ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে ইনশাআল্লাহ্, তন্মধ্যে আহমদীদের ঈমানী দৃঢ়তা লাভও অন্তর্ভূক্ত। এ বিষয়েও আমার কাছে কিছু চিঠি আসে যে এ কুরবানী সমূহের মাধ্যমে আমাদের ভয় দূর হয়ে গেছে এবং আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য লাভের আকাংখা সৃষ্টি হচ্ছে। পূর্বে যেসব শিথিলতা ছিল সেগুলো দূর করার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। যেভাবে আমি পূর্বে বলেছি, জামা'তের তবলীগের ক্ষেত্র আরো উন্মুক্ত হয়েছে।

অতএব, **যদিও আমাদের শহীদগণ অনেক বড় কুরবানী পেশ করেছেন, কিন্তু এ কুরবানীর পেছনে যে মহা বিজয়ের সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, তা আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করছে যে প্রকৃত ঈদ তো সেদিন আসবে যখন এসব কুরবানীর বিনিময়ে লোকেরা নিজেদের ভেতর এবং পৃথিবীবাসী নিজেদের ভেতর পবিত্র পরিবর্তন সাধন করে বিশ্ববাসী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পতাকা তলে সমবেত হয়ে যাবে।** আহমদীদের এ কষ্টকর অবস্থা বলে দিচ্ছে যে এখন 'ঊসর' অর্থাৎ কষ্টের সময়। যার বিনিময়ে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.)-এর সাথে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী 'ইউসর' অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ্যময় অবস্থা সৃষ্টি হওয়া নির্ধারিত আছে। তার মধ্যে এ কুরবানী সমূহ উজ্জ্বল এক অধ্যায় বলে গণ্য হবে।

ইনশাআল্লাহ্ এ মহা বিজয়ের ডঙ্কা বাজবে যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। **ভবিষ্যতে যখন আহমদীয়াত ও প্রকৃত ইসলামের বিজয়ের আনন্দ উদযাপন করা হবে বা বিজয় লাভের আনন্দ উৎসব পালন কালে আহমদী শহীদগণের স্মৃতিকে ইতিহাস সর্বদা জাগরুক রাখবে। বিশ্ববাসীকে বলা হবে, আজ তোমরা যে বিজয়ের আনন্দ বা ঈদ উদযাপন করছ তা ঐসব কুরবানীর বিনিময় স্বরূপ যা শহীদগণ তাদের রক্ত দিয়ে প্রদান করেছেন। শত্রুরা আহমদীদের রক্ত সস্তা মনে করে । এ রক্ত তো প্রতিদিন তার মূল্য বাড়িয়েই চলছে।** ইসলামের প্রথম যুগের শহীদদের কুরবানী সমূহকে ইতিহাস আজও ভূলেনি, তবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরনের চেষ্টাকারীদের কুরবানী সমূহকেও ইতিহাস কখনো ভূলবে না। অতএব, শহীদদের স্ত্রী সন্তান, পিতামাতা, ভাইবোন বরং আমাদের সবাইকে এ বিষয়ে আমাদের প্রিয় শহীদদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ঈদ উদযাপন করা জরুরী। তারা যুগ ইমামের চিন্তা দূর করে তাদের রক্ত দান করে জামা'তের ইতিহাস রচনা করেছেন, তেমনিভাবে আমাদেরকে ঈদ উদযাপনের নতুন পন্থাও শিখিয়ে গেছেন।

কয়েক বছর ধরে আমরা দেখছি যে আত্মার পবিত্রতার জন্য যেখানে আমরা রমযানে বৈধ জিনিষগুলো কুরবানী করি, আর এর পর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমরা ঈদ উদযাপন করি, সেখানে আমাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা রমযানে নিজেদের প্রাণ কুরবাণী করে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে প্রকৃত ঈদ উদযাপনকারীতে পরিনত হয়েছে এবং খোদা তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মর্যাদা লাভ করেছে। যদিও যারা পেছনে রয়ে গেছে তাদের জন্য এটি খুব কষ্টদায়ক। আপনজনদের বিচ্ছেদের দুঃখ তো ভূলা যায় না। যখন কোন আনন্দের উপলক্ষ্য আসে, যখন ঈদ আসে, তখন এ মর্ম-পীড়া আরো বেশী জাগ্রত হয়।

গত রমযান থেকে এখন পর্যন্ত এ বছরে ৯৭ জন শহীদ হয়েছেন। অনেক বিধবা রয়েছেন যারা তাদের ইদ্দতের সময় পূর্ণ করছেন। ঈদ সত্ত্বেও তারা বেদনা-ভারাক্রান্ত। এমন সন্তান আছেন যারা এ বছর ঈদে তাদের পিতার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হবে। অনেক মা আছেন যারা তাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে বুকের সাথে লাগিয়ে ঈদ মুবারক বলতেন, কিন্তু এ বছর তাদের কবরে গিয়ে দোয়া করে নিজে হৃদয়ে সান্তনা খুঁজবেন। অনেক এমন পিতা আছেন যারা তাদের ছেলেদের সহায়তায় ঈদের নামায পড়তে যেতেন। এখন অন্য কারো সহায়তায় তাদের কবরে দোয়া করতে যাবেন।

এটি এমন পরিস্থিতি যে রক্ত সম্পর্কীতদের বরং অন্তরঙ্গ বন্ধুদেরও আজ অস্থির করবে এবং ঈদের আনন্দের স্থলে দুঃখকর অবস্থা সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমরা যদি ভেবে দেখি, রমযানে ও ঈদের দিন পৃথিবীতে কত মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং ধৈর্য্য ধারন করতে হয়।

এ শহীদদের মৃত্যু তো জামাতকে জীবন দানের জন্য হয়েছে। এ শহীদগণ তো তাদের প্রাণ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সত্য প্রেমিক হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে দান করেছেন। আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জীবন দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে আজ আমাদের ঈদ উদযাপন না করার কোন কারন নেই। যখন আমরা ঈদ উদযাপন করব এবং এ ঈদের দিন হৃদয়ের কষ্ট সমূহকে খোদা তাআলার সমীপে পেশ করব, তখন এ দোয়া সমূহ এ শহীদদের মর্যাদা আরো বৃদ্ধির মাধ্যম হবে এবং আমাদের জন্যও প্রশান্তির উপকরন সৃষ্টি করবে। কষ্টের সময়িক যুগ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখের দীর্ঘ যুগে পরিবর্তিত হবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ঈদ সম্পর্কিত ইলহাম সমূহ আমাদেরকে ঈদের খুশির সংবাদ দেয়। এজন্য এ প্রশ্নই উঠে না যে আমরা আল্লাহ্ তাআলা ঈদের যে উপলক্ষ্য সৃষ্টি করেছেন তা উদযাপন করব না এবং ঐ আনন্দে অংশ নেব না যা খোদা তাআলা এ যুগের ইমামের সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে,'আমদন ঈদ মোবারক বাদত' ঈদ তো রয়েছে তা পালন করো বা না করো। (তাযকেরা, পৃ-৬২৬, ৪র্থ সংস্করণ) প্রথম ফার্সী অংশের অনুবাদ হচ্ছে, ঈদের আগমন তোমার জন্য কল্যাণময় হোক।

অতএব, ঈদের আগমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য কল্যাণকর এবং তাঁর কারনে আহমদীয়া জামা'তের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্যও কল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহর জন্যও প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনে নিবে। নয়তো আল্লাহ্ তাআলা পরিস্কার বলেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক স্থানে এর ব্যাখ্যা করেছেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা ঈদের উপকরন তো সৃষ্টি করেছেন। স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে সাথে যে বিজয় সমূহ নির্ধারিত করে রেখেছেন তার উপকরণ তো হয়েছে। এখন তাকে মান্যকারীদের জন্য ঈদ কল্যাণময়। আর যারা তাঁকে মানেনি তারা বঞ্চিত থাকবে। ঈদের সাথে বিজয়ের সংবাদ শুনিয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, **'আল-ঈদুল আ'খারু তানা'লু মিনহু ফাতহান্ আযীমা'** (তাযকেরা, পৃ-৫৮৬, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪) অর্থাৎ আরেকটি ঈদ রয়েছে যাতে তুমি এক বড় বিজয় লাভ করবে।

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা যেহেতু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বিজয় সমূহের সুসংবাদ দিচ্ছেন, আবার এ সুসংবাদও ঈদের সাথে এবং ঈদের উদ্ধৃতি দিয়ে দিচ্ছেন, তবে আমরা কেন আমাদের দুঃখ ভূলে গিয়ে যুগ ইমামের সাথে মহা আনন্দে অংশ নেব না। আমাদের এ দুঃখজনক অবস্থায় খোদা তাআলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নির্গত অশ্রুও রয়েছে যা কেবল আল্লাহ্ তাআলার সমীপে প্রবাহিত হয়, কিন্তু শত্রুদের নিকট নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করে না। এ ব্যাপারে কেউ অভিযোগ অনুযোগ করে না। নিশ্চয় এ অশ্রু আমাদেরকে বিজয়ের নিকটবর্তী করার কারন হবে।

পাকিস্তানে আহমদীদের জীবন অতিষ্ট করা হচ্ছে। তাদের উপর যে অত্যাচার হচ্ছে এবং তারা যে বীরত্ব ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে এসবের মোকাবেলা করছে, এজন্য বিশ্বের সব আহমদীদের তাদের জন্য দোয়া করা প্রয়োজন। সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি থাকা সত্ত্বেও যে মনোবলের সাথে তারা ঈদ উদযাপন করছে, প্রকৃত ঈদ তো তাদেরই। হয়তো বহির্বিশ্বের সব আহমদীগণ জানে না যে শত্রুদের ভয়ানক ষড়যন্ত্র রয়েছে। এর একটি তাজা উদাহরণ, মর্দান মসজিদে আত্মঘাতী হামলা চালিয়ে বড় ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আহমদীদের নিরাপদে রেখেছেন। আমরা ঐসব লোকদের দেখে নিয়েছি যে তারা কিরূপ চেষ্টা করছে। এসব আহমদীদের মসজিদে আসা নিঃসন্দেহে বড় সাহসের কাজ এবং প্রাণ কুরবানীর জন্য সর্বদা তৈরী থাকার এটি একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত। পুরুষগণ তো মসজিদে এসে থাকে, কিন্তু ভয়ের আশংকা থাকায় বর্তমানে নারী ও শিশুদের মসজিদে আসা এবং এক স্থানে সমবেত হওয়া থেকে বিরত রাখা হয়েছে। যে কারনে আমার কাছে কয়েকজন নারী অস্থিরতা প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন।

সম্ভবত এটি প্রথম ঘটনা যে পাকিস্তানে নারী ও শিশুদের ঈদের নামায আদায়ের জন্য এক স্থানে সমবেত হতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। শত্রুদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কারনে এ পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। যে জন্য আমি বলেছি শিশু ও নারীদের মধ্যে তীব্র অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে। আমি এসব নারী ও শিশুদের বলছি, শত্রুদের এসব ষড়যন্ত্রের জন্য তোমাদের মসজিদে যেতে বারন করা হয়েছে এবং ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়তে বারন করা হয়েছে, তোমাদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য এটি করা হয়েছে। কেননা বাহ্যিক উপকরন এবং নিরাপত্তার চাহিদা পূর্ণ করাও মানবিক দায়িত্ব ও শরীয়ত সম্মত সিদ্ধান্ত। যদিও আপনারা মসজিদ ও ঈদগাহ্ সমূহে ঈদ উদযাপন করতে পারবেন না, কিন্তু আপনাদের গৃহকে তো দোয়া ও কান্নাকাটি দ্বারা পূর্ণ করতে পারেন। আপনাদের ঘরগুলোকে দোয়া ও কান্নাকাটিতে এমনভাবে পূর্ণ করে দিন যেন খোদা তাআলা স্বয়ং আপনাদের হৃদয়ে সান্তনা দিয়ে বলেন, হে আমার বান্দীগণ! হে আমার বাচ্চাগণ! **'ফাইন্না মাআল উসরে ইউসরা, ইন্না মাআল উসরে ইউসরা'** অর্থাৎ 'জেনে রাখ নিশ্চয় কষ্টের সাথেই রয়েছে স্বাচ্ছন্দ্য। নিশ্চিত কষ্টের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে।' আল্লাহ্ তাআলার এ প্রতিশ্রুতি নিশ্চয় সত্য।

অতএব, এ স্বাচ্ছন্দ্য আসবে এবং নিশ্চয় আসবে। তোমাদের কষ্ট ও ক্ষয়-ক্ষতির দিন নিশ্চয় স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্যে পরিবর্তিত হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিকে সত্য প্রতিপন্ন করে দেখাবে। অতএব, তোমরা নিজ প্রভুর সমীপে বিনত হওয়া ও কান্নাকাটি করা থেকে কখনো ক্লান্ত হয়ো না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে, 'ছেলেরা বলে কাল ঈদ, নয় তো পরশু হবেই।' (তাযকেরা, পৃ-১৬১, ৪র্থ সংস্করণ ২০০৪)

অতএব, আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয় । সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

জার্মানী জলসার একটি অধিবেশনে জার্মানদের প্রতি আমার একটি বক্তব্য ছিল। অ-আহমদী এবং অমুসলমান জার্মানগণও এসেছিল। আমি তাদের বলেছিলাম,

তোমরা আমার কথাকে পাগলের প্রলাপ ভাবতে পার। কিন্তু আমরা এ বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, যে জামাত আল্লাহ্ তাআলা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এটিই এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে, এ অটল নিয়তিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। কিন্তু তা হবে প্রেম ভালবাসার মাধ্যমে, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নয়, ত্রাস সৃষ্টি করে নয়, নিষ্পাপ লোকদের হত্যা করে নয়, কারো সম্পদ ও জমি জবর দখল করে নয়, রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা করে নয়। বিশুদ্ধ অন্তরে পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আমাদের উদ্দেশ্য এটাই এবং এটি অতিকথন নয়। ইনশাআল্লাহ্ তাআলা নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা এটি পূর্ণ করবেন। যখন পৃথিবীতে খোদা তাআলার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, ঐ দিনই আমাদের জন্য প্রকৃত ঈদের দিন হবে। আহমদীগণ শহীদ হচ্ছে, বিভিন্ন কুরবাণী করছে, নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে গৃহহীন হচ্ছে, তবে এ ঈদকে স্বাগত জানানোর জন্য যা আহমদীয়া জামা'তের জন্য নির্ধারিত আছে, আহমদীয়া জামা'তের জন্য বাহ্যত দৃষ্ট এ রাত সমূহ আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে কদরের রাত্রি (সৌভাগ্যের রজনী) যা ঈদের খুশীর পূর্বে প্রতি রমযানেও আগমন করে থাকে এবং আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত মহাপুরুষদের যুগেও এসে থাকে। এর বিস্তারিত বিবরন আমি আমার খুতবাতেও বর্ননা করেছি। এসব রাতই কবুলিয়তের মর্যাদা লাভ করে মহা বিপ্লব ঘটায় এবং এরপর এক ঈদ নয় বরং ঈদের এক ধারা আরম্ভ হয়।

আজ পাকিস্তান বা অন্য কিছু স্থানে জামা'ত কষ্টের যুগ অতিক্রম করছে, তাতে কি? যে কষ্টের যুগ তারা অতিক্রম করছে, এ দুঃখ-কষ্ট তো আমাদেরকে স্বাচ্ছন্দ্য ও বিজয়ের পথ প্রদর্শন করছে। অতএব, এ বিষয়টি স্বরণে রেখে ধৈর্য ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার করুণা, সাহায্য ও তাঁর সাক্ষাত যাচনা করতে থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের প্রিয়গণ যে কুরবানী করেছেন, যেজন্য বাহ্যত ঘর সমূহে দুঃখকর অবস্থা বিরাজমান, অনুরূপভাবে নারী ও শিশুদের ঈদের আনন্দে অংশগ্রহণ করতে না পারার দুঃখ, এ দুঃখ কষ্টগুলোকে আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিন। এ দোয়া করুন যেন আমাদের ধৈর্য আল্লাহ্ তাআলার সমীপে গৃহীত হয়ে তাঁর দৃষ্টিতে সম্মানযোগ্য হয়ে যায়। এরপর বিশ্ববাসী দেখবে কুরবানী সমূহ ও শহীদদের রক্ত কত বড় পরিবর্তন সাধন করতে পারে। আসুন আজ আমরা এ দোয়া করি, আমাদের ধৈর্য ও মনোবল যেন আল্লাহ্ তাআলার ভালবাসা আকষণ করে। তাঁর কৃপা বৃষ্টি যেন পূর্বের চেয়ে অধিক বর্ষিত করার কারন হয়।

খোদা তাআলা যেন আমাদেরকে প্রকৃত ঈদের আনন্দ, খোদা তাআলার দৃষ্টিতে যা প্রকৃত ঈদ, সেটি দান করেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদের সকলকে আজ ঈদের প্রেক্ষিতে ঈদ মোবারক জানাচ্ছি। আপনাদের সবাইকে যারা আমার সামনে বসে আছেন এবং সমগ্র বিশ্বের আহমদীগণ যারা এ খুতবা শুনছেন বা যারা শুনছেন না সবাইকে অনেক অনেক ঈদ মোবারক।

আমাদের দোয়ায় রত থাকা প্রয়োজন, সেই প্রকৃত ঈদ কাল নয়তো পরশু অবশ্যই আসবে, সেটি যেন শীঘ্র আমাদের জীবনে চলে আসে। আমাদের কোন দুর্বলতার জন্য যেন সেটি ছুটে না যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জামা'তকে খোদা তাআলা বিজয় দান করবেন, যা হবে মহা বিজয়। সেটি কবে হবে তা তিনিই ভাল জানেন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়াতে আহমদী শহীদদের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের পরিবার ও স্বজনদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা তাদের সদিচ্ছাগুলোকে পূর্ণ করুন এবং তাদেরকে নিরাপদে রাখুন। পাকিস্তানের অধিবাসী সব আহমদীদের নিজ হিফাযতে রাখুন। তাদের দুঃখ আনন্দে পরিনত করুন।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পথে যারা বন্দী আছেন তাদের মুক্তির উপকরন সৃষ্টি করুন। মালী কুরবানীকারীদের সম্পদে অগণিত বরকত দান করুন। বর্তমানে পাকিস্তানে জামা'তের সদস্যগণ জামাত ও জামা'তের স্থাপনা সমূহের নিরাপত্তার জন্য যে কুরবানী করছেন, তাদের জান-মালের হিফাযতের জন্যও দোয়া করুন। সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের জন্য এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য খুব দোয়া করুন। আল্লাহ্ তাআলা সবাইকে সর্বপ্রকার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ রাখুন। সবাই নিজেদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে তার খাঁটি ও বিশ্বস্ত বান্দায় পরিনত করেন।

[খুতবা সানীয়ার পর হুযূর আনোয়ার (আই.) দোয়া করেন। এরপর বলেন:]

আমি বিনীতভাবে আরেকটি ঘোষণা করছি, বরং ক্ষমা চাচ্ছি যে সাধারণত এ ঈদে আমি প্রত্যেকের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করি। কিন্তু গত চার পাঁচদিন যাবৎ আমার বাহুতে প্রচন্ড ব্যথা শুরু হয়েছে। ডাক্তারও পরামর্শ দিয়েছে যে করমর্দন না করাই উত্তম। খুব শক্তিশালী ব্যাথা নাশক ওষুধ খেয়ে এখনো ঠিক আছি। আল্লাহ্ তাআলার কৃপায় কাজে কোন সমস্যা হচ্ছে না। কিন্তু আমার ধারনা চার পাঁচ হাজার লোকের সাথে করমর্দন করলে হয়তো ব্যথা কিছু না কিছু বেড়ে যাবে। এজন্য আমার ধারনা সতর্কতার জন্য এবং ডাক্তারের পরামর্শও এটাই যে করমর্দন না করাই উত্তম। এজন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তবে সমস্ত হলে গিয়ে সবাইকে আমি অবশ্যই ঈদ মোবারক জানাব।

আপনাদের সবাইকে ঈদ মোবারক। যে যেখানে বসে আছেন বসে থাকুন। আপনাদের ইচ্ছা হলে আপনারা বসে থাকুন বা জামাতী কোন প্রয়োজনে বসার প্রয়োজন থাকলে বসুন, নয়তো অবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ তাআলা সকলের হাফেয হউন। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুলাহ্।

অনুবাদ: **মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।
[পূণর্মুদ্রিত]

রূপক-বর্ণনার অন্তরালে

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(৩য় কিস্তি)

(১) হযরত ঈসা (আ.)-এর পূনরাবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি শাব্দিক অর্থে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়ঃ

মুসলিম উম্মতের মধ্যে একতা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পূণ:প্রতিষ্ঠা ও পূণ:প্রচারের জন্য এবং পৃথিবীব্যাপী সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার্থে আখেরীযুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রামাণ্য হাদীসের গ্রন্থাবলী হতে এই সকল প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে যে সকল তথ্যাবলী রয়েছে সেগুলির সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

১- সহী বুখারী শরীফের হাদীসে প্রতিশ্রুতি রয়েছেঃ *"কায়ফা আনতুম এযা নাযালা ইবনু মার-ইয়ামা ফিকুম ওয়া ইমামুকুম"*। অর্থ- তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম হবেন।

২- অনুরূপভাবে সহী মুসলিম শরীফে প্রতিশ্রুতি রয়েছেঃ "কায়ফা আনতুম এযা নাযালা ইসাবনু মার-ইয়ামা ফিকুম আম্মাকুম মিনকুম"। অর্থ: তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে যখন তোমাদের মধ্যে ইসা ইবনে মরিয়ম আবির্ভূত হবেন। ফলত: তিনি তোমাদের মধ্য হতেই তোমাদের নেতৃত্ব দান করবেন।

৩- সহী ইবনে মাজাহ শরীফে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মাহদী ও ঈসা ইবনে মরিয়ম একই ব্যক্তি হবেন *(লাল মাহদীয়ু ইল্লা ঈসাবনু মারইয়ামু)*।

সুতরাং এই ধরণের বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইমাম মাহদী প্রতিশ্রুত ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাব এমন একটি বিষয় যা অস্বীকার করলে এই সকল হাদীসকেই (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যা বলে অভিহিত করতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে পূর্ণ হবে? আজ হতে দু'হাজার বছর পূর্বে বণী ইসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.) কি সশরীরে এই পৃথিবীতে পুণরায় আবির্ভূত হবেন, অথবা সেই হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুরূপ কোন মহাপুরুষ (অর্থাৎ 'মসীলে ঈসা' হিসেবে) মুসলিম উম্মত হতেই আবির্ভূত হবেন? পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাসের ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

সুতরাং সশরীরে এই পৃথিবীতে এসে তাঁর পক্ষে ইসলামের প্রচার ও পুণ:প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন উঠেনা। এমতাবস্থায় ***'মসীলে ঈসা'*** হিসাবে মুসলিম উম্মত হতেই তাঁর আবির্ভাব হওয়ার মাধ্যমে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হওয়াটাই স্বাভাবিক। ভবিষ্যদ্বাণীতে ব্যবহৃত ভাষার এরূপ সাদৃশ্য ও প্রতীকপূর্ণ প্রয়োগ এবং সেগুলির ব্যাখ্যা ও তাবির করার রীতি রয়েছে। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগের একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। দৃষ্টান্তটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

ইহুদীদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী (মালাখী ৪: ৫ এবং রাজাবলী ২:১১ পদ) ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, এলিয়া নবী (অর্থাৎ হযরত ইলিয়াস আ.) আকাশে জীবিত রয়েছেন এবং ঈসা মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে প্রথমত: তিনিই আকাশ হতে অবতরণ করবেন। ইহুদীদের এই দাবীর উত্তরে সমাগত নবী হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) বলেন যে, উক্ত ঐশী প্রতিশ্রুতি হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর আগমণে পূর্ণ হয়ে গিয়েছে (মথি:১১:১৪ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, (১) হযরত ইলিয়াস (আ.)-এর মসীল (অনুরূপ বা সদৃশ) হিসেবে হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে, (২) আকাশ হতে কোন ব্যক্তির সশরীরে অবতরণ করার ধারণা পূর্বেও ছিল এবং সেই ধারণা একজন 'সদৃশ' নবীর আগমণের দ্বারা রূপকভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং (৩) আজও যে সকল ইহুদী এই ধারণা অর্থাৎ শাব্দিক অর্থে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার জন্য আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে তাদের আশা কোন দিনই পুরণ হবে না।

তেমনিভাবে বর্তমানকালে যারা ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে "বণী ঈসরাঈলী নবী হযরত ঈসা (আ.)-এর সশরীরে আকাশ হতে (প্রায় দু'হাজার বছর ধরে আকাশে অবস্থান করার পর) বর্তমানের সমস্যা-বিক্ষুব্ধ মুসলিম জাতিসহ বিশ্বকে উদ্ধার করার লক্ষ্যে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন"– এই আশায় দিন কাটাচ্ছে তারাও অতীতের ন্যায় ভুল করছেন এবং তাদের সেই আশা

পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইতিহাসের ঘটনা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যাবলীর ভিত্তিতে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। সুতরাং সশরীরে এই পৃথিবীতে এসে তাঁর পক্ষে ইসলামের প্রচার ও পুণ:প্রতিষ্ঠার গুরুদায়িত্ব পালন করার প্রশ্ন উঠেনা।

কোনদিনই বাস্তবে পুরণ হওয়ার নয়। কারণ কোন মানুষের পক্ষে এই দীর্ঘ সময় ধরে আকাশে বসবাস করা প্রকৃতির নিময় বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরাগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির আগমনের দ্বারা পূর্ণ হওয়া অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ এবং এটাই হযরত ইলিয়াস (আ.) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ.)-এর ঘটনা দ্বারা সমর্থিত এক ঐতিহাসিক সত্য। এই বিষয়টির মধ্যে যে তত্ত্ব ও তথ্যগত সূক্ষ্মতা রয়েছে তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা অত্যাবশ্যক এবং তজ্জন্য বাহ্যিক জ্ঞান-বুদ্ধি ছাড়াও আল্লাহ্‌র কাছে দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য কামনা করা উচিত।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু সম্পর্কে অনেক প্রমাণ রয়েছে। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিগুলোর আলোকে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

পবিত্র কুরআনের ত্রিশটি আয়াত হতে প্রমাণিত যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। এই সকল আয়াতের বরাত নিম্নে দেওয়া হলো (বিসমিল্লাহ বিশিষ্ট আয়াতকে ১নং আয়াত ধরে আয়াত নম্বর দেয়া হয়েছে):-

আলে ইমরান ১৪৫, নিসা ১৫৮-১৫৯, আলে ইমরান ৫৬, মায়েদা ৭৬, বণী ঈসরাঈল ৯৪, আহযাব ৪১, আম্বিয়া ৯, রহমান ২৭-২৮, মায়েদা ১১৮, মরিয়ম ৩২, বাকারাহ ২৫৬, নিসা ১৬০, নহল ২১, ঈয়াসীন ৬৯, রুম ৪১, বাকারাহ ১৪২, ফজর ২৮-৩১, মুমেনুন ৫১, আম্বিয়া ৩৫, নিসা ৭৯, ফাতির ৪৪, মুমেনুন ১৬, ত্বাহা ৫৬ ফুরকান ২১, মুরসালাত ২৬-২৭, ফুরকান ৮, নহল ৯১, আরাফ ২৬, মায়েদা ১৮, দুখান ৫৭।

ওফাতে ঈসা (আ.) সম্বন্ধে হাদীসের প্রমাণঃ

১। "রা আইতু ঈসা ওয়া মূসা ওয়া ইবরাহীম ফা-আম্মা ঈসা ফা-আহমারু জাদুন আরিজুস সাদরে"। (বুখারী খন্ড-২) অর্থ: আমি (কাশফে) ঈসা, মূসা ও ইবরাহীম (আ.)-কে দেখেছি। ঈসার রং লাল এবং তাঁর কেশ কুকড়ানো এবং বক্ষ প্রশস্ত।

২। *"লাও কানা মূসা ওয়া ঈসা হাইয়াইনে লামাওয়াসিয়া হুমা ইল্লাত তিবায়ী"*। অর্থ: "যদি মূসা ও ঈসা জীবিত থাকতেন তাহলে আমার অনুসরণ ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর ছিলনা।" (ইবনে কাসির, খন্ড ২ পৃ:২৪৬)

এই দু'টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম (আ.) এর ন্যায় হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন।

৩। *" আম্মা বাদু মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়া সাল্লামা ফা-ইন্না মুহাম্মাদান কাদমাতা ওয়ামান কানামিনকুম ইয়াবুদুল্লাহা ফা-ইন্নাল্লাহা হাইনউ লা-ইযামুতু কালাল্লাহুতা'লা ওমা মুহাম্মাদুন ইল্লা রাসুলুন ক্বাদখালাত মিন কাবলিহির রুসুল"*।

অর্থঃ "হযরত আবুবকর (রা.) বলেন: অত:পর তোমাদের মধ্যে যাহারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ইবাদত করিত তাহারা জানিয়া রাখো যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর ওফাত হইয়া গিয়াছে এবং তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করিত তাহারা জানিয়া রাখো যে আল্লাহ্ জীবিত এবং তাঁহার মৃত্যু নাই। (অত:পর তিনি বলিলেন যে) আল্লাহ তা'লা বলিয়াছেন: মুহাম্মদ একজন রসুল ব্যতিত অন্য কিছু নহেন। তাঁহার পূর্ববর্তী সকল রসুলই মরিয়া গিয়াছেন।" (বুখারী কিতাবুল মগায়ী)

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের অব্যবহিত পরে সংঘটিত অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বুখারী শরীফের উপরোক্ত বর্ণনা অনুযায়ী সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী পূর্ববর্তী সকল রসুলই ইন্তেকাল করেছেন। পূর্ববর্তী রসুলদের মধ্যে হযরত ঈসা (আ.) অবশ্যই অর্ন্তভুক্ত এবং তাঁর ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রমের কথা কোন সাহাবী উপস্থাপন করেন নাই। ফলত:এই ঘটনার দ্বারা হযরত ঈসা (আ.) সহ পূর্ববর্তী সকল নবীর ওফাত প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহাবীগণের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বুজুর্গানে-দ্বীনের অভিমত অনুযায়ী ওফাতে ঈসা (আ.)ঃ

হযরত ঈসা (আ.) এর ওফাত প্রাপ্তি সম্বন্ধে সাহাবীগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন। (১) হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) বলেছেন: *"ওলাকাদ কবেযা ফিল-লাহালাতিল্লতি*

উরিজা ফিহা বিরূতে ঈসা ইবনে মার-ইয়ামা লাইলাতা সাবয়িনা ওইসারিনা মিন রামযানা।" অর্থাৎ "তিনি (হযরত আলী রা.) সেই রাতে ইন্তেকাল করেছিলেন যে রাতে হযরত ঈসা (রা.)-এর আত্মা উত্থিত হয়েছিল অর্থাৎ তিনি পরলোকগমন করেছিলেন-ঐ রাত্রিটি ছিল ২৭ রমযান।" (তাবাকাতে ইবনে সাদ:খন্ড-৩)

(২) ইমাম মালেক (রহ.) বিশ্বাস করতেন যে, হযরত ঈসা (রা.) মারা গেছেন। (মজমাউল বেহার,খন্ড-১ পৃ:২৮৬)।

(৩) মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর আল্লামা শেলতার অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করেছেন ('আল-ফতোয়া'মুজাল্লাতুল আজহার ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ইং)

(৪) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা কাশেম নানুতুবী বলেছেন যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন (লতায়েফে কাসেমীয়া পৃ:২২)।

(৫) মওলানা আকরাম খাঁ সূরা আলে ইমরানের ৩৯ নং টীকায় হযরত ঈসা (রা.) এর মৃত্যুকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছেন। এতদ্ব্যতিত অনেক বুযুর্গান এবং তফসীর-কারক হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাতের কথা স্বীকার করেছেন।

(২) মসীলে ঈসা সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতির তাৎপর্যঃ

(ক) আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সূরা নূরের ৭ম রুকুতে মুসলিম উম্মত হতে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:-

"ওয়াদাল্লাহুল লাযিনা আমানু মিনকুম ওয়া আমেলুস সালেহাতে লা ইয়াসতাখলেফান্নাহুম ফিল আরদে কামাসতাখলাফাল লাযিনা মিন কাবলিহিম...।" (আয়াত-৫৬)

অর্থ:-"তোমাদের মধ্যে যাহারা ইমানদার ও সৎকর্মশীল তাদের সঙ্গে আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি নিশ্চয় তাহাদিগকে পৃথিবীতে খলিফা বানাইবেন যেভাবে তিনি তাহাদের পূর্ববর্তীদের মধ্য হইতে খলিফা বানাইয়াছেন...।"

উপরোক্ত আয়াতে খেলাফত প্রতিষ্ঠার রূপরেখা সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মূসায়ী উম্মতের সঙ্গে সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য আরবী ***'কামা'*** (অনুরূপ বা সাদৃশ্য) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে অন্যত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গে হযরত মূসা (আ.)-এর সাদৃশ্য বর্ণনার জন্য 'কামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে (সূরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত-১৬)। তৌরাতেও মূসা-সদৃশ নবীর ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮:১৫-২০)। এই উপমা দ্বারা কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্যের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে- বস্তুতপক্ষে হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধূ হযরত মূসা (আ.) হইতে শ্রেষ্ঠতর নহেন, তিনি সর্বকালের নবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। উপরোক্ত সূরা নূরের খেলাফতের রূপরেখা সম্বন্ধে যে সাদৃশ্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা থেকে সাধারণভাবে হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মধ্যস্থিত সাদৃশ্য এবং তাঁদের অনুসারীগণের সাদৃশ্য ছাড়াও বিশেষভাবে বর্তমান যুগের জন্য একটি ভবিষ্যদ্বাণীর ইঙ্গিত রয়েছে। ইহুদীদের চরম অধ:পতনের যুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর চতুর্দশ শতাব্দিতে এমন একজন খলিফা আসা আবশ্যক, যিনি আধ্যাত্মিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক শক্তি ও আদর্শে হযরত ঈসা (আ.)-এর অনুরূপ হবেন। ' হযরত ঈসা-সাদৃশ্য' এরূপ খলিফাকেই হাদীসে প্রতিশ্রুত ঈসা, (মসীহ মাওউদ) এবং 'ইমাম মাহদী' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

(খ) উপরোক্ত আয়াতে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও তথ্যের সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো।

ইবনে মাজার হাদীসে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষকে 'খলিফাতুল্লাহিল মাহদী' (আল্লাহ্‌র খলিফা মাহদী) বলা হয়েছেঃ *"ফা এযা রায়াইতুমুহু ফাবাই-উহু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাছ ছালজে ফা-ইন্নাহু খলিফাতুল্লাহিল মাহদীউ"।* অর্থ:- "ইমাম মাহদী প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া মাত্রই তাঁর হাতে বয়াত (দীক্ষা গ্রহণ) করিও। এমন কি যদি বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়েও যেতে হয় তবুও। নিশ্চয় তিনি আল্লাহর খলিফা ইমাম মাহদী।

অন্য একটি হাদীসে আখেরী যুগে মসীহ (আ.)-এর আগমনের কথা বলা হয়েছে: "কায়ফা তাহলেকু উম্মাতুন আনা ফি আউয়ালিহা ওয়াল মসীহ ফি আখেরিহা।" (অর্থ: "আমার উম্মত কেমন করে ধ্বংস হবে যার প্রথমদিকে আমি রয়েছি আর শেষ দিকে মসীহ রয়েছেন" (মেশকাত ও জামেউস সগীর)।

তিরমিযি শরীফের একটি হাদীসে মুহাম্মদী উম্মতের অবস্থার সঙ্গে বনী ঈসরায়েলী অবস্থার সাদৃশ্য বর্ণিত হয়েছে: *"লাইয়াতিআন্না আলা উম্মাতি কামা আতা আলা বণী ঈসরাঈল"* (অর্থ" আমার উম্মত বণী ঈসরাঈল জাতির অনুরূপ হবে")।

অন্য একটি হাদীসে মুসলিম ইতিহাসের একটি রূপরেখা বর্ণীত হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) বলেছেন: অর্থ- " আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাহেন তোমাদের মধ্যে এই নবুয়ত থাকিবে এবং তাহার পর তিনি তা উঠাইয়া লইবেন। তাহার পর নবুওয়াতের তরিকায় খেলাফত হইবে। যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তারপর জুলুমের পথে রাজতন্ত্র কায়েম হবে এবং যতদিন আল্লাহ্ চাহেন ততদিন উহা থাকিবে। তাহার পর জোরপূর্বক শাসন (তথা সাম্রাজ্যবাদ) কায়েম হইবে এবং আল্লাহ্ তা'লা যতদিন চাহেন ততদিন উহা থাকিবে এবং তাহার পর তিনি উহা উঠাইয়া লইবেন। তারপর পুণরায় নবুওয়াতের তরিকায় খেলাফত কায়েম হইবে। অত:পর তিনি (সা.) চুপ রহিলেন" (মেশকাত)।

উপরোক্ত হাদীসের ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ক্রমে পূর্ণ হয়ে বর্তমান যুগে এসে ***"খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত"*** পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইন্তেকালের পর খেলাফতে রাশেদা (৬৩২-৬৬১ খৃ:), অত:পর রাজতন্ত্রমূলক উমাইয়া শাসন ব্যবস্থা (৬৬১-৭৫০ খৃ:), তারপর আব্বাসীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন (৭৫০-১২৫৮ খৃ:) এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যবাদী শাসন (১২৮৮-১৯০৮ খৃ:) দ্বারা উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পর্যায়ক্রমে পূর্ণতা লাভ করেছে। সুতরাং যুক্তিসঙ্গতভাবে উক্ত হাদীসের শেষাংশে বর্ণীত "খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুয়ত" সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

(চলবে)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্ নবীঈন কেন?

খন্দকার আজমল হক

(২য় কিস্তি)

যেহেতু কুরআন শেষ শরীয়ত, কুরআনের পর আর কোন শরীয়ত বা ঐশী কিতাব আসবে না (৫:৪)। সেহেতু হযরত রাসূল করীম (সা.) অবশ্যই শেষ শরীয়তদাতা নবী। তবে শরীয়ত নিয়ে কেউ না আসলেও শরীয়তের শিক্ষা প্রদানের জন্য নবী আসার প্রয়োজন হবে, কেননা কুরআন মজীদ হতে জানা যায় যে, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানদের ভিতর হতে কুরআনের শিক্ষা উঠে যাবে। (১৭:৮৯) হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানদের এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছু বাকী থাকবে না, কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, মসজিদ সমূহ আবাদ হবে কিন্তু তাতে ধর্মের ভাব থাকবে না। আকাশের নীচে নিকৃষ্ট জীব হবে আলেমগণ। (বায়হাকী, শোয়ায়েবুল ঈমান) এহেন অবস্থায় কুরআনের শিক্ষা পুন:স্থাপন নবী ব্যতীত আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ কিতাব শিক্ষা দেওয়া একমাত্র নবীদেরই কাজ। (২:১৩০) কেননা, আল্লাহ্ কিতাব নাযেল করেন, তিনি তাতে কি বলতে চান তা' তিনিই জানেন। নবীগণ তাঁর নিকট হতে জ্ঞান লাভ করে তা' মানুষকে শিক্ষা দেন। এজন্যই মুসলমানদের ভিতর আলেম ওলামা বলে কথিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও ইমাম মাহ্দী, মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে তাঁর আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "যখন তোমরা তাঁকে দেখতে পাবে, তাঁর হাতে বয়আত করবে, যদি বরফের ওপর হামাগুঁড়ি দিয়েও যেতে হয়, নিশ্চয় তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল-মাহ্দী।" (সুনানে ইবনে মাজা-বাবু খুরুজুল মাহদী) অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, অত:পর আল্লাহ্‌র খলীফা ইমাম মাহ্দী আসবেন, তোমরা তাঁর আগমন বার্তা শোনামাত্রই তাঁর নিকট হাজির হয়ে বয়আত করবে।" (মিসবাহ যুজাজা, হাসিয়া ইবনে মাজাহ, বাবু খুরুজুল মাহদী)।

হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) যে নবী হবেন তা' তাঁর নামের শেষে আলাইহিস সালাম ব্যবহার হওয়ায় প্রমাণিত হচ্ছে, কেননা আলাইহিস সালাম কেবলমাত্র নবীদের নামের শেষেই ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন হযরত আদম (আ.), হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.) ইত্যাদি।

পূর্বের কিতাব শিক্ষা প্রদানের জন্য এরূপ নবী অতীতেও এসেছিলেন, যেমন হযরত মূসা (আ.)-এর পরবর্তী নবীগণ। তাদের নিজস্ব কোন কিতাব ছিল না, তওরাত শিক্ষা প্রদানের জন্য তাঁদের পাঠানো হয়েছিল। (৪:৪৫) তাঁরা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নবী ছিলেন। কিন্তু কুরআনের শিক্ষা প্রচারের জন্য আগমনকারী নবীকে অবশ্যই রাসূল পাক (সা.)-এর পায়রবী করে আসতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত ৪:৭০ আয়াতে (সূরা নেসার ৭০নং আয়াতে) এরূপ নবীর আগমনের কথাই বলা হয়েছে। যেখান আল্লাহ্ বলেছেন, "এবং যারা আল্লাহ্ এবং এই রসূলের আনুগত্য করবে তারা ওই সকল লোকদের মধ্যে শামিল হবে, যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন– নবী এবং সিদ্দিক এবং শহীদ এবং সালেহ্‌গণের মধ্যে এবং এরাই সঙ্গী হিসেবে উত্তম।"

যেহেতু এরূপ নবী হুযূর (সা.) এর ইতায়াত করার কারণে হবেন, সেহেতু তিনি নবী গঠনকারী নবী, এজন্য তিনি এ সকল নবীদেরও পিতা বা খাতামান্ নবীঈন।

আয়াতটিতে, "মা'আ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যার জন্য বলা হয় যে "মা'আ"-এর অর্থ সঙ্গী বিধায়, ***"মাআল্লাযীনা আনআমাল্লাহু আলাইহিম মিনান্নাবীঈনা ওয়াসিদ্দিকীনা ওয়াশশুহাদাই ওয়াস সালেহীন।"*** এর অর্থ হবে, তারা সেই সকল লোকের সঙ্গী হবে, যাদেরকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করেছেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণ।" অর্থাৎ যারা নবী না আসায় বিশ্বাসী তারা বলতে চান যে, আল্লাহ্ এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইতায়াত করলে তাঁর উম্মতের মাঝে কেউ কেউ নবীর সঙ্গী হবেন নবী হবেন না, সিদ্দীকের সঙ্গী হবেন সিদ্দিক হবেন না, শহীদদের সঙ্গী হবেন, শহীদ হবেন না, সালেহ্ এর সঙ্গী হবেন সালেহ্ হবেন না, কিন্তু বাস্তব তো এর বিপরীত। আল্লাহ্ ও রাসূল পাক (সা.)-এর ইতায়াত করে তাঁর উম্মতে অনেক সিদ্দীক ও শহীদ হয়েছেন। আর সালেহ্ তো প্রত্যেক মু'মিন মুসলমানই হয়ে থাকেন। সঙ্গী হবার কারণে যদি সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ হতে বাধা না থাকে তবে নবী হতে বাধা কোথায়? প্রখ্যাত তফসীরকারক আল্লামা ফখরুদ্দিন রাজী (রহ.) তাঁর তফসীরে কবীরে

মুসলমানদের এমন এক সময় আসবে যখন ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছু বাকী থাকবে না, কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, মসজিদ সমূহ আবাদ হবে কিন্তু তাতে ধর্মের ভাব থাকবে না। আকাশের নীচে নিকৃষ্ট জীব হবে আলেমগণ।

আয়াতটির এ অর্থই করেছেন। তিনি লিখেছেন, "নবী নবীর সঙ্গী, সিদ্দীক সিদ্দীকের সঙ্গী, শহীদ শহীদের সঙ্গী, সালেহ্ সালেহ্‌র সঙ্গী হবেন।"

অতএব উপরের আলোচনা হতে দেখা গেল যে, এখানে "মা'আ" এর অর্থ হবে অন্তর্ভুক্ত কেবল সঙ্গী নয়। আল্লাহ্ আমাদের দোয়া শিখিয়েছেন, "***ওয়া তাওয়াফফনা মা'আল আবরার।***" অর্থাৎ "আমাদের নেককার করে মৃত্যু দাও" নেককার না হয়ে শুধু নেককারদের সঙ্গী হয়ে মৃত্যু হলে কি নাজাত বা মুক্তি পাওয়া যাবে? অতএব দেখা গেল যে "মা'আ"-এর অর্থ সব সময়ই সঙ্গী হয় না।

জাগতিক জীবনেও দেখা যায় যে, যে যে শ্রেণীর লোক সে সেই শ্রেণীর লোকের সঙ্গী বা বন্ধু হয়ে থাকে। যেমন ছাত্র ছাত্রের সঙ্গী, শিক্ষক শিক্ষকের সঙ্গী, আইনজীবি আইনজীবির সঙ্গী, রিক্সা চালক রিক্সা চালকের সঙ্গী। কোন ছাত্র কোন শিক্ষকের বা কোন আইনজীবি কোন রিক্সা চালকের সঙ্গী হয় না। এদের সংগঠনও সেভাবেই গড়ে ওঠে।

সুতরাং আলোচ্য আয়াত হতে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুবর্তিতা করে তাঁর উম্মতের ভিতর সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহ এর ন্যায় নবীও হতে পারে।

উম্মতে মুহাম্মদীয়া-র ভিতর যে নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে, কুরআন করীমের নিম্নের আয়াত হতে তা জানা যায়।

আল্লাহ্ বলেন, 'হে বনী আদম! (আদম সন্তানগণ) তোমাদের নিকট যদি তোমাদের মাঝ থেকে রসূলগণ এসে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তখন যারা তাক্ওয়া অবলম্বন করবে এবং সংশোধন করবে সেক্ষেত্রে তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"

"কিন্তু যারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার করে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরাই আগুনের অধিবাসী। তথায় তারা দীর্ঘকাল থাকবে।" (৭:৩৬-৩৭)

অনেকে বলে থাকেন যে, এখানে বনি আদম বলতে হুযূর পাক (সা.) এর পূববর্তী বনী আদমের কথা বলা হয়েছে। এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, আয়াতে বর্ণিত আগত নবীদের না মানার জন্য ২য় আয়াতে যে শাস্তির কথা বলা হয়েছে তা' কুরআন নাযেল হবার সময় ও তার পরবর্তীতে জন্মগ্রহণকারী বনী আদমদের জন্য প্রযোজ্য। কেননা পূর্বে জন্মগ্রহণকারী বনী আদমদের জন্য পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের আদেশ পালন বাধ্যতামূলক ছিল। যে আদেশ সম্পর্কে তারা জ্ঞাতই নয়, সে আদেশ তারা কীভাবে পালন করবে এবং কেনই বা তারা শাস্তি পাবে? আর এখানে পূর্বের কোন ঘটনার উল্লেখ করেও বনী আদমকে সম্বোধন করা হয়নি যে, কারণে তাদের প্রসঙ্গ আসতে পারে।

উল্লেখ্য, এখানে বণী আদম বলায় প্রতীয়মান হয় যে, আয়াতে বর্ণিত নবীগণ সকল মানুষের জন্য আসবেন, কেননা কুরআনের যে সকল স্থানে বনী আদম বলা হয়েছে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই পৃথিবীর সকল মানুষ সম্পর্কিত কথাই বলা হয়েছে। (দেখুন- ৭:২৭-২৮, ৩২) আর কুরআন পাক হতে জানা যায় যে, একমাত্র হুযূর পাক (সা.)-ই সকল মানুষের জন্য এসেছিলেন (৭:১৫৯)। আয়াতটিতে রসূলগণের আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত রসূল করীম (সা.) ছাড়াও আরও রাসূলের আগমন ঘটবে। তাঁর পরবর্তী নবীগণ যেহেতু তাঁরই কাজ করতে আসবেন, সেহেতু তারাও সকল মানুষের জন্যই আসবেন অতএব এ আয়াত হতেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুযূর পাক (সা.)-এর পরও নবী আসতে পারে।

নবী আসার ধারণা যে নতুন নয় কুরআন পাকেই তার প্রমাণ মিলে। আল্লাহ্‌র কালাম পবিত্র কুরআন থেকে জানা যায় যে, বনীইস্রাঈলীগণও এ ভ্রমে পড়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মৃত্যুর পর বলতে থাকে যে, "আর নবী আসবে না" যেমন বলা হয়েছে, "এবং ইতিপূর্বে ইউসুফ (আ.) প্রমাণাদিসহ তোমাদের নিকট এসেছিল। কিন্তু যা কিছু নিয়ে সে তোমাদের নিকট এসেছিল, তৎসম্বন্ধে তোমরা সন্দেহেই পরে রইলে। এমনকি যখন তার মৃত্যু হল, তখন তোমরা (নিরাশ হয়ে) বলতে লাগলে, 'আল্লাহ্ এরপর আর রাসূল আবির্ভূত করবেন না।' এভাবে আল্লাহ্ প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে পথভ্রষ্ট হতে দেন।" (৪০:৩৫)

অনেকদিন নবী না আসার ফলে মানুষের ভিতর যে, "আর নবী আসবে না" এরূপ ধারণার জন্ম হয় কুরআন মজীদে তারও উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ্ বলেন, "হে আহলে কিতাব! রাসূলগণের (আবির্ভাবের) বিরতির পর তোমাদের নিকট আমাদের রাসূল এসেছে, যে তোমাদের নিকট (সকল বিষয়) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে, পাছে তোমরা বল যে, আমাদের নিকট না কোন সুসংবাদদাতা এসেছে এবং না কোন সতর্ককারী। (৫:২০)

বহুদিন নবী না আসার কারণে এ ভ্রমে নিপতিত হয়েছে। অথচ হাদীস শরীফে উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ভিতর যে নবী আসবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ভাবে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি মুসলমানদের ভিতর অনেক জ্ঞান তাপসই এরূপ নবীর আগমনের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে গিয়েছেন।

এ সম্পর্কে প্রথমে দু'টি হাদীস নিয়ে বর্ণনা করা যাক।

(১) হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সুসংবাদ ব্যতীত নবুওয়াতের আর কিছুই বাকী নেই।" প্রশ্ন করা হল, "সুসংবাদ কি?" তিনি বললেন, "সত্য স্বপ্ন।" (বুখারী)

অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে নবুওয়াতের ভিতর কেবলমাত্র সুসংবাদ বাকী আছে। অতএব সুসংবাদ নবুওয়াতের অংশ। যে কারণে নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী বলা হয়েছে। যেমন কুরআন বলে, "রাসূলগণ সুসংবাদদাতা ও সতর্কারী।" (৪:১৬৬)

কুরআন পাক হতে এও জানা যায় যে, যিনি সুসংবাদদাতা তিনি সতর্ককারীও বটে। এবং শুধুমাত্র নবীগণই এ আখ্যা পেয়ে থাকেন। সকল প্রকার নবুওয়াতের দরজা বন্ধ হলে সুসংবাদদাতার কথা হযরত রাসূল করীম (সা.) বলতেন না। বলা হয়ে থাকে যে "সুসংবাদ"-এর অর্থ তো সত্য স্বপ্ন, ওহী নয়। যে কেউ তা পেতে পারে। জানা প্রয়োজন, এখানে বর্ণিত সত্য স্বপ্ন ও সাধারণ স্বপ্নের ভিতর পার্থক্য আছে। না হলে হুযূর পাক (সা.) 'মুবাশশিরাত' শব্দ ব্যবহার করতেন না। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাশারত বা সুসংবাদ শব্দটি নবীদের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যারা বলেন, 'মুবাশশিরাত' এর অর্থ সত্য স্বপ্ন, ওহী নয়। তাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "নবীদের স্বপ্নও ওহী"। (বুখারী)

হাদীসটি হতে জানা গেল যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে শরীয়ত নিয়ে কেউ না আসলেও "সুসংবাদদাতা" হিসেবে আগমনকারী নবীর দরজা খোলা আছে।

(২) হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা (একদা) হযরত মূসা (আ.)-কে আদেশ করেছিলেন, 'বনী ইস্রাঈলকে বলে দাও, যে ব্যক্তি আমার নিকট এরূপ অবস্থায় মিলিত হবে যে, সে আহমদ (আ.)-এর ওপর অবিশ্বাসী তাকে আমি দোযখে নিক্ষেপ করব, সে যে কেউ হোক না কেন।' হযরত মূসা (আ.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আহমদ (আ.) কে?' আল্লাহ্ তা'লা বললেন, 'হে মূসা! আমার মহিমা ও শক্তির কসম, আমি এমন কাউকে সৃষ্টি করিনি যে তার অপেক্ষা আমার নিকট বেশী প্রিয়। আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃজন করবার বিশ লক্ষ বছর পূর্বে আরশের ওপর তার নাম আমার নামের সাথে সংযুক্ত করে লিখে রেখেছি। কসম আমার মহিমা ও শক্তির, যতক্ষণ পর্যন্ত না হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করে, ততক্ষণ সৃষ্টির অপর কারও জন্য জান্নাতে প্রবেশ করা হারাম।' হযরত মূসা (আ.) বললেন, 'হে প্রভু, আমাকে সেই উম্মতের নবী করে দিন।' আদেশ হল, 'সেই উম্মতের নবী সেই উম্মতের মধ্য হতে হবে।' তিনি নিবেদন করলেন, 'আমাকে সেই উম্মতের মধ্যে করে দিন।' আদেশ হল, 'তুমি প্রথমে হয়েছ এবং সে পরে হবে। অবশ্য তোমাকে এবং তাকে জান্নাতে একত্র করে দিব।'"

হাদীসটি মৌলনা আশরাফ আলী থানভী 'নাশবুত তীব যিকরিন নবীয়েল হাবীব' পুস্তক হতে নেয়া হয়েছে।

এ হাদীস হতেও দেখা যাচ্ছে যে, উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ভিতর নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে। এ সম্পর্কে আরও হাদীস পেশ করা যেতে পারে।

এখন উম্মতে মুহাম্মদীয়ার ভিতর যে, নবুওয়াতের দরজা খোলা আছে, সে সম্পর্কে কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম মনীষীর অভিমত তুলে ধরা হচ্ছে।

(১) হযরত মুহিউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) তাঁর 'ফসুসুল হিকাম' পুস্তকে লিখেছেন, "শরিয়তবিহীন সাধারণ নবুওয়াত তাঁদের (উম্মতে মুহাম্মদীয়ার) জন্য অবশিষ্ট রাখা হয়েছে।"

(২) মোল্লা আলী কারী (রহ.) তাঁর মৌযুয়াতে কবীরে লিখেছেন, "তাঁর পর এমন কোন নবী আসবেন না যিনি তাঁর ধর্মকে রহিত করবেন এবং তাঁর উম্মত হবেন না।"

(৩) ইমাম শায়রানী (রহ.) লিখেছেন, "নিশ্চয়ই নবুওয়াত জিনিসটাই উঠে যায় নাই, মাত্র শরীয়ত ওয়ালা নবুওয়াত উঠে গিয়েছে।" (আল ইয়া ওয়াকিতুল জাওয়াহের)

(৪) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মোহাদ্দেস দেহলবী (রহ.) লিখেছেন, "তাঁর দ্বারা নবীদের খতম করা হয়েছে অর্থাৎ এমন কাউকেও দেখা যাবে না, আল্লাহ্ পাক যাকে শরীয়তের আদেশ দিবেন।" (তফহীমাতে ইলাহিয়াহ)

(৫) দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা কাশেম নানুতবী সাহেব লিখেছেন, "নবী করীম (সা.)-এর পরবর্তীকালে কোন নবীর জন্ম হওয়া স্বীকার করলেও খাতামিয়াতে মুহাম্মদীয়ার কোন রূপ ইতর বিশেষ (অর্থাৎ ব্যত্যয় হয় না।" (তাহযীরান নাস-পৃ: ২৮)

নবীর আগমন সম্পর্কিত এরূপ অভিমত আউলিয়া-এ-কেরাম বলে পরিচিত আরও অনেকের লেখাতেই পাওয়া যায়।

যারা হুযূর পাক (সা.)-এর পর নবী না আসায় বিশ্বাসী, তাদের উপস্থাপিত কয়েকটি হাদীস নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক। তারা বলে থাকেন, "যেহেতু হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'লা নাবীয়া বাদী" অথচ শুধু এই বাক্যে কোন হাদীস নেই। অর্থাৎ, ***ক্বালা, ক্বালা রাসূলুল্লাহ্ (সা.) 'লা নাবীয়াবাদ'*** বলে পৃথক বা স্বতন্ত্র কোন হাদীস কেউ দেখাতে পারবে না। হাদীস গ্রন্থের যে সকল স্থানে ***'লা নাবীয়াবাদী'*** এসেছে, সকল স্থানেই অন্য কোন বাক্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসেছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি বহুল প্রচলিত হাদীস নিয়ে আলোচনা করলে পাঠক দেখতে পারেন যে, এ সকল হাদীসের প্রকৃত অর্থ কি?

(চলবে)

নাজাতের দশক ও ইতিকাফ

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র মাহে রমযানকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম দশক রহমত, দ্বিতীয় দশক মাগফেরাত আর তৃতীয় দশক হচ্ছে নাজাতের। দেখতে দেখতে আমাদের মাঝ থেকে পবিত্র মাহে রমযানের রহমত ও মাগফিরাতের দিনগুলি অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে আর প্রবেশ করতে যাচ্ছি নাজাতের দশকে।

রমযানকে বিদায় দিতে গিয়ে আমাদের প্রিয় প্রভু ও নেতা হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের এমনটি হয়ে থাকতো যে আধ্যাত্মিক বসন্ত নিজের চমক দেখিয়ে যখন বিদায় নেয়ার ক্ষণে পৌঁছে যেত তখন তিনি (সা.) কোমর বেঁধে নিতেন আর রমযানের কল্যাণরাজিতে নিজ ডালি ভরে নিতে কোন ত্রুটি করতেন না।

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর শেষ দশকের ইবাদত সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি রমযানের শেষ দশকে প্রবেশ করলে তিনি (সা.) কিভাবে কোমর বেঁধে নিতেন অর্থাৎ খুবই তৎপর হতেন এবং নিজ রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জীবিত করতেন। সাথে সাথে তাঁর (সা.) পরিবার পরিজনকেও জাগাতেন (বুখারী, কিতাবুস্ সওম)।

শেষ দশকে হুযূর (সা.) ইতিকাফে বসতেন এবং লাইলাতুল কদরের অন্বেষণে রাতগুলো ইবাদতের মাধ্যমে জাগিয়ে রাখতেন। ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ হলো কোন স্থানে আবদ্ধ হয়ে যাওয়া বা অবস্থান করা। ইসলামী পরিভাষায় 'ইবাদতের সংকল্প নিয়ে রোযা রেখে মসজিদে অবস্থান করার নাম ইতিকাফ' (হিদায়া, বাবুল ইতিকাফ)। রমযান মাসের শেষ দশকে ইতিকাফে বসা সুন্নতসম্মত। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীস থেকে জানা যায়, হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর পর তাঁর (সা.) পবিত্র স্ত্রীগণও এ সুন্নতের অনুসরণ করতেন (সহি মুসলিম, কিতাবুল ইতিকাফ)। হুযূর (সা.) রমযান মাসে ১০ দিনই ইতিকাফে বসতেন। উল্লেখ্য, হযরত নবী করীম (সা.) জীবনের শেষ রমযানে ২০ দিন ইতিকাফ করেছিলেন।

২০শে রমযান ফজরের নামাযের পর ইতিকাফ আরম্ভ করা উচিত। এজন্যে ১৯শে রমযান বাদ মাগরিব ই'তিকাফস্থলে এসে যাওয়াই অনেকে ভাল মনে করে থাকেন। ইতিকাফে বসে মুতাকিফরা একাগ্রচিত্তে ব্যক্তিগত দোয়া ছাড়াও সবার জন্য সময়োপযোগী দোয়া করেন।

ইতিকাফের জন্য উপযুক্ত স্থান হলো জামে মসজিদ। এ প্রসঙ্গে কুরআন করীমে উল্লেখ রয়েছে- ***ওয়া আনতুম আকিফুনা ফিল মাসাজিদ*** অর্থাৎ তোমরা মসজিদে ইতেকাফ কর (সূরা বাকারা ঃ ১৮৮

হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি লাইলাতুল ক্বদর লাভ করলে কি করবো? হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে বললেন– "আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু 'আন্নি" অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী। মার্জানাকে তুমি ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে মার্জনা কর।

আয়াতাংশ)। হাদীসেও নির্দেশ এসেছে হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন ***লা ই'তিকাফা ইল্লা ফিল মাসজিদুল জামে'*** অর্থাৎ জামে মসজিদ ছাড়া ই'তিকাফ নেই। (আবুদাউদ, কিতাবুল ইতিকাফ পৃঃ ৩৩৫)। ইমামগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, বিভিন্ন অসুবিধার কারণে ইতিকাফ যে কোন মসজিদে বা অপারগতার কারণে মসজিদের বাইরেও ইতিকাফ হতে পারে। মহিলারা ঘরে নামাযের জন্য একটি বিশেষ স্থান নির্ধারণ করে সেখানে ইতিকাফে বসা তাদের জন্য উত্তম (হিদায়া, বাবুল ই'তিকাফ, পৃষ্ঠা ১৯০)।

ইতিকাফকারী দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে আল্লাহ্‌র দিকে ঝুঁকে পড়ে যেন তিনি তাঁর অভীষ্ট মনোবাসনা পূর্ণ করে তবে ইতিকাফ থেকে উঠতে পারেন। এটা কঠিন সাধানার বিষয়। তাই মুতাকিফকে এমন কোন কাজকর্ম বা আচার আচরণ করা উচিত নয় যাতে তার এ সাধনা ব্যহত হয় বা প্রশ্নবিদ্ধ হয় অথবা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায় বা তার মনোবাসনা অপূর্ণ থেকে যায়। একজন তাপস সাধনের ন্যায় একাগ্রতা ঐকান্তিকতা শৃঙ্খলা ও পবিত্রতার লাগাম যেন হাত ছাড়া হতে না দেন।

রমযানের এই শেষ দশকের একটি রাতে এসে থাকে লাইলাতুল ক্বদর। পবিত্র কুরআন হাদীসে লাইলাতুল ক্বদর সম্পর্কে উল্লেখ আছে কিন্তু শবে বরাতের কোন শিক্ষা কুরআন হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। লাইলাতুল ক্বদর বা সৌভাগ্য রজনী লাভ বোধ করি মু'মিনের সবচেয়ে বড় পাওয়া। সারা জীবন কঠোর সাধনা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মাধ্যমে শয়তানী প্রবৃত্তিরূপে দৈত্যকে নিধন করার পর মু'মিনের কাছে আসে সেই মুহূর্তটি-সেই পাওয়ার মুহূর্তটি যা আল কুরআনের সূরা ক্বাদরে 'লাইলাতুল কদর' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। হাজার মাসের চেয়েও উত্তম এ মুহূর্তটি। হাজার মাস অর্থাৎ প্রায় ৮০ বছর। একজন মু'মিন সাধারণত ৮০ বছর বেঁচে থাকেন।

সুতরাং তার সারা জীবনের সাধনার ফল লাভের মুহূর্তটি তার গোটা জীবনের চেয়েও কদরের তথা কল্যাণের ও মর্যাদার।

লাইলাতুল ক্বদর বলতে আমরা সাধারণত একটি রাতকে মনে করে থাকি। ভৌগলিক কারণে সারা দুনিয়ায় যেহেতু একই সময়ে রাত থাকে না সেজন্যে লাইলাতুল কদরকে আমাদের গণনার একটি রাত নির্ধারণ করা সঠিক বলে মনে হয় না। লাইলাতুল ক্বদর এমন একটি সময় মু'মিনের ব্যক্তিগত জীবন বা জাতীয় তথা মিল্লাতী জীবনে রাতের ন্যায় কাজ করে থাকে। মু'মিন সাধনার শেষ লগ্নে তার প্রভুর দিদার বা দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করে বাক্যালাপে ভূষিত হয়। এ মুহূর্তটিই আসলে তার জীবনে লাইলাতুল ক্বদর। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ মুহূর্তটি অবশ্যই মু'মিনের জীবনে আসে রমযানের কঠোর সাধানার শেষ দশকে। রোযার সাধনার মাধ্যমে মু'মিন পানাহার ত্যাগ করে, নিদ্রাকে কম করে দিয়ে এবং নিজের প্রজননকে সাময়িকভাবে হলেও স্বীকার করে আল্লাহ্‌র রঙে রঙিন হয়। তাই সে আল্লাহ্‌র সাথে নিজ নিজ সামর্থানুযায়ী বাক্যালাপ করার সৌভাগ্য লাভ করে।

হাদীস পাঠে জানা যায়, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-হযরত রাসূল করীম (সা.) ক্বদরের রাত্রি সম্বন্ধে বলেছেন 'রমযান মাসের শেষের দশ রাত্রিসমূহে লাইলাতুল ক্বদরের অনুসন্ধান কর' (বুখারী)।

তিনি (সা.) আরো বলেছেন ' তোমাদের কাছে রমযান এসেছে। রমযান মোবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ফরজ করেছেন। এ মাসে বেহেশতের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর দোযখের দ্বারসমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত' (বুখারী)।

হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আয়েশা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, আমি লাইলাতুল ক্বদর লাভ করলে কি করবো? হযরত নবী করীম (সা.) তাঁকে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে বললেন– ***"আল্লাহুম্মা ইন্নাকা 'আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু 'আন্নি"*** অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় তুমি মার্জনাকারী। মার্জানাকে তুমি ভালবাস। অতএব তুমি আমাকে মার্জনা কর (তিরমিযী)।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার মাঝে অনেকের ধারণা যে লাইলাতুল কদরের রাত বলতে ২৭ রমযানকে বুঝায়। তাই এই রাতেই সবাই খুব বেশী ইবাদত বন্দেগী করে থাকে। আর বাকী রাতগুলোতে তেমন ইবাদত করতে দেখা যায় না। ২৭ রমযানের রাতই যে লাইলাতুল ক্বদরের রাত আসলে এই বিশ্বাসটি ঠিক নয়। রাসূল করীম (সা.)-এর হাদীস থেকে আমরা এটাই জানতে পারি লাইলাতুল ক্বদর রমযানের শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোর যে কোন একটি রাত। তাই আমাদেরকে এই শেষ দশকের বিজোড় রাতগুলোতে লাইলাতুল ক্বদরের অন্বেষণ করতে হবে। আর রমযান মাসের শেষ দিনগুলোতে আমাদের সবার বেশি বেশি উপরোক্ত দোয়াটি করা উচিত। মহান আল্লাহ্ তা'লার কাছে এ দোয়াই করি তিনি যেন এই পবিত্র রমযানে আমাদের সবাইকে নাজাত দান করেন এবং তাঁর রহমতের ছায়ায় আবৃত করে রাখেন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

প্রকাশিত হয়েছে

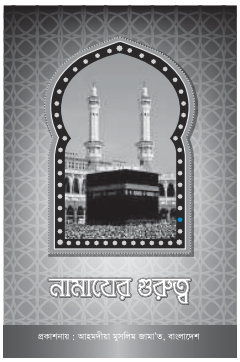

পাঠকের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে **হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)** প্রদত্ত নামায সংক্রান্ত পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ খুতবা সম্বলিত আকর্ষণীয় বই-

'নামাযের গুরুত্ব' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বইটির মূল্য ৩০/- (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

বইটি কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন এবং এর থেকে উপকৃত হোন।

রমযানের শেষ দশকেই রয়েছে আত্মার নাজাতের প্রতিশ্রুতিসহ লায়লাতুল ক্বাদরের উপহার।

কৃষিবিদ মোহাম্মদ ফজল-ই-ইলাহী

প্রতি বছর আবর্তে ইসলামে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুসলমানের ঘরের দোয়ারে এসে দাঁড়ায় পবিত্রতম মাস "মাহে রমযান"। একান্ত একাগ্রতা ও প্রচন্ড নিষ্ঠার সাথে ইবাদত করার বিশেষ তাগিদ নিয়ে আসে এই মাস। এই মাসের ঘোষিত বাণী হলো; প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিনটি দশক মানুষের জন্য যথাক্রমে, রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের। সুতরাং সঙ্গত কারণেই এ মাস প্রভুত কল্যাণে ও অফুরন্ত বরকতের মাস। আত্মাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ করে নেয়ার মাস।

বিগত বছরে আত্মায় সংগোপনে সঞ্চিত তাবৎ পাপ অপরাধ ও হৃদয়াভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত সব পঙ্কিলতাকে ধুয়ে মুছে সাফ করে সজ্জিতরূপে সজ্জনে পরিণত হওয়ার মাস। যারা এ মাসে এমনটি করতে পারবেন তারা অবশ্যই সাধুজন হবেন। বসন্ত মৌসুমে ফুটন্ত ফুলের সমারোহ হতে মধু আহরণ করে মৌ-মক্ষিকা যেমন সেই মৌসুমকে সার্থক করে তেমনিভাবে একনিষ্ঠ চিত্তের খোদা প্রেমিকগণ রমযানে নিবেদিত এবাদত গোজারের মাধ্যমে জীবনোদ্দেশ্যকে সার্থক করে এবং আবিষ্কার করে নেয় রমযানের সেই রাতটিকে যে রাতের ইবাদত হাজার মাস অর্থাৎ ক্রমাগত ৮০ বছর এবাদতের চেয়েও অধিক মর্যাদাবান, আর এ রাতটির অস্তিত্ব রমযানেরই শেষাংশের কোন এক বিজোড় রাত্রিতে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র গ্রন্থ, আল কুরআনে বলেন, "এবং তোমাকে কিসে অবহিত করিবে যে, 'লায়লাতুল ক্বাদ্‌র' কি? লায়লাতুল ক্বাদ্‌র হাজার মাস অপেক্ষাও উত্তম। ঐ রাতে ফেরাশ্‌তাগণ এবং কামেল রূহ সকল তাহাদের প্রতিপালকের হুকুম অনুযায়ী যাবতীয় বিষয়সহ নাযেল হয়" (৯৭:৩-৫)। এ রাত কখন আসে, কীভাবে আসে এবং কেমন আরাধ্য আত্মার কাছে মহিমান্বিত এ রজনী ধরা দেয়, তদ্বিষয়ে কিছু লেখাই হচ্ছে আমার আজকের উদ্দেশ্য।

হযরত রাসূল পাক (সা.) বলেছেন, "তোমাদের জীবনে আগত প্রতিটি রমযানের শেষ দশকের কোন এক বেজোড় রাত্রিতে এ সম্মানিত রজনীকে তালাশ করো।" অর্থাৎ রমযানের ত্রিশটি দিবস অসম্ভব কঠোর সাধনায় অবিরাম আরাধনার পর এ মাসের প্রায় শেষ প্রান্তে সে আরাধক তার কাংখিত রাতের সন্ধান লাভ করবে। ইহাই হলো রমযানের নিবিড় এবাদতের মর্মকথা। নদীর জলের মাছগুলো যেমন জেলের ছড়ানো জালের শেষ প্রান্তে এসে জমা হয় তেমনিভাবে রমযানের যতসব কল্যাণ তার সবটুকুই সে মাসের শেষ দশকে এসে সঞ্চিত হয় আর সেই অংশের কোন বেজোড় রাত্রিতেই আত্মগোপন করে থাকে হাজার মাসের চেয়েও উত্তম ও ঐ রজনী, ঐশী জগতে যার নাম 'লায়লাতুল ক্বাদ্‌র'। অতএব পুণ্যে পরিপূর্ণ এ রাতের সন্ধান লাভ করা কোন সাধারণ বিষয় নয় এবং ইহা কোন সাধারণ কাজও নয়। যে মহাজন বছরের প্রতিটি দিবস রাত সাতিশয় সাধনায় দ্বীনের এবাদতে ব্রত থেকে পুণ্যতায় পূর্ণ হতে পারবেন কেবল তিনিই সন্ধান পাবেন সে রাতের সওগাত সম্ভার।

মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআনে বলেন, "স্মরণ রেখো, আল্লাহ্‌র স্মরণেই হৃদয় প্রশান্তি লাভ করে" (১৩:২৯)। মু'মিন মাত্রই মাহে রমযানের পবিত্রতায় আল্লাহ্ স্মরণের মাত্রাকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেয়, ইবাদতের একাগ্রতাকে আরো বাড়িয়ে দেয়। এমন কোন পুণ্যের কাজ নেই যা কিনা সে হাতছাড়া করে। তখন তার অন্বেষণ মাত্র একটাই, আর তা হলো, লায়লাতুল ক্বাদরকে প্রাপ্ত হওয়া। এ প্রাপ্যতার মাঝেই সে আত্মার শান্তি আর এ উপার্জনের মাঝেই সে জীবনের সার্থকতা। প্রতিটি বছর রমযান তার সেই স্বর্গ-সুধা প্রদানের জন্যই আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান করে।

আসুন হে আমার প্রিয়গণ! এ রমযানে আমরা সবাই সিয়াম সাধনায় নিবিড়চিত্তে নিবেদিত হয়ে সে মাহাত্ম্য আহরণে মত্ত হই। 'শাহরু' রামাযানাল্লাযী উনযিলা ফিহিল কুরআন অর্থাৎ রমযান সেই মাস যে মাসে কুরআন নাযেল হয়েছে" (আল কুরআন ২:২৮৬)। সুতরাং রমযানের

ত্রিশটি দিন রোযা পালন ও তদসঙ্গে কুরআন পাঠ করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অতীব পুণ্যের কাজ। আত্মাকে ঐশী সাজে সাজানোর এক বিশেষ সময়। তবেই হাশরের দিন রমযান ও কুরআন এ বলে আমাদেরে সুপারিশ করবে যে, রোযা বলবে, "হে খোদা! আমি তাকে পানাহার এবং কু-প্রবৃত্তি হতে নিবৃত্ত রেখেছি, এ কারণে তুমি তার জন্যে আমার সুপারিশ গ্রহণ করো" আর কুরআন বলবে, 'আমি তাকে রাতে নিদ্রা হতে বিরত রেখেছি এবং তাকে শুইতে দেইনি, সুতরাং এই কারণে তুমি তার জন্যে আমার সুপারিশ কবুল করো'। (বাইহাকী)। এ দ্বিবিধ ইবাদতে আমরা যত নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট হবো রমযানের আগমন আমাদের জন্য ততই কল্যাণকর হবে।

উল্লেখ্য যে, রমযানের শেষ দশকেই রয়েছে আত্মার নাজাতের প্রতিশ্রুতিসহ লায়লাতুল ক্বাদরের উপহার। এমনিভাবে বিভিন্ন ইবাদতে খোদা মানুষের আত্মার মঙ্গলার্থে নানান উপায়ে মজুত রেখেছেন তাঁর অনন্যসব অবদান। এসব ব্যবস্থাদি মানুষের প্রতি খোদার অনুকম্পা প্রদর্শনেরই প্রমাণ। এক্ষণে আমাদের উচিত হবে খোদা সকাশে ধর্ণা দিয়ে সেসব অনুকম্পাদি আহরণ করা। নচেৎ জীবন হবে মূল্যহীন। আমরা তো কোনভাবেই প্রত্যাশা করতে পারি না যে, আমাদের জীবনে আবারও এ রমযান ফিরে আসবে। আবারও এর তৃতীয়াংশের অবদান লাভ করতে পারবো। তাই আমাদের প্রত্যেকের স্বীয় আত্মার নাজাতের জন্য এখনই ক্রন্দনে রত হয়ে যাওয়া উচিত। উচিত হবে রমযানের শেষাংশের সকল কল্যাণ লাভের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

এতদবিনিময়ে যেন আমাদের প্রিয় খোদা আমাদেরকে রমযানের শেষ দশকের সবকটি নেয়ামত দান করেন। যদি আমরা আমাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ও খোদার দয়ায় ভাগ্যের সুপ্রসন্নতার ফলে খোদার সেই নেয়ামত পেয়েই যাই তখন আমাদের কি করা উচিত? এক্ষেত্রে রাসূল (সা.)-এর উপদেশ বাণী হলো, তিনি (সা.) বলেছেন, "যখন তোমরা লায়লাতুল ক্বাদরের সন্ধান পাবে, তখন এ দোয়াটি পাঠ করবে, ***'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নি,*** হে আল্লাহ্ তুমি অবশ্যই ক্ষমাশীল। তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ কর, কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর" (তিরমিযী)।

হে আমাদের পরম প্রিয় করুণাময় খোদা! তুমি আমাদের প্রত্যেককে ক্ষমা কর এবং প্রতিটি রমযানের সবকটি নেয়ামত আমাদের প্রত্যেককে দান কর। কেননা তুমি রহমান ও রাহিম, পরম দাতা ও দয়ালু, আমীন।

প্রকৃত মু'মিন নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখে

মৌলবী মুহাম্মদ আমীর হোসেন

ইসলাম সত্যিকার ভাবে মানবতার শিক্ষা প্রদান করে থাকে। যারা ইসলামের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের কখনো কোন জাতির ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হতে পারে না। আজ যে পৃথিবীতে অরাজকতা চলছে তা ইসলাম সমর্থন করে না বা ইসলাম বলে না যে, তোমরা এ ধরণের ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি কর। বরং পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "অথচ তাদেরকে কেবল আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে তাঁর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে সদা তাঁর দিকে বিনত হয়ে থাকতে নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে আদেশ দেয়া হয়েছিল। আর এ হলো চিরস্থায়ী ধর্ম" (৯৮ : ৬)।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, "একদিন আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট ছিলাম, এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মিশমিশে কালো চুলওয়ালা একজন লোক আমাদের নিকট আত্ম প্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্যে (আগুন্তকের ন্যায়) ভ্রমণের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাঁকে চিনতেও পারছিল না, তিনি নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে বললেন, 'হে মুহাম্মদ (সা.) আমাকে বলুন ইসলাম সম্বন্ধে। ইসলাম কি? হুযূর (সা.) উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসূল, এ ঘোষণা করবে। নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও, এই হল ইসলাম। তিনি বললেন, 'ঠিক বলেছেন' (মেশকাত, মূল বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

ইসলামের মূল শিক্ষা কি তা আমরা উপরের আলোচনাতে বুঝতে পারলাম। এটাই যদি সত্যিকার ইসলাম হয়ে থাকে তাহলে আজ ইসলামের নামে যা কিছু হচ্ছে এটা আবার কোন ইসলাম? মানবতা হলো ধর্মের মূল বিষয়। যে ধর্মে মানবতা নেই সেটা কখনো ধর্ম হতে পারে না। মানবতা বিসর্জন দিয়ে অন্যের ওপর অত্যাচার, যুলুম করা, ধর্মীয় উপাসনালয় পুড়িয়ে ফেলা, বাড়ী ঘরে আগুন দেওয়া ও লুটপাট করা এগুলো কখনো ইসলামী শিক্ষা হতে পারে না। এই ধ্বংসযজ্ঞ মধ্য যুগীয় বর্বরতাকে হার মানায়।

ইসলাম শব্দটির মধ্যে অনেক শিক্ষা লুকায়িত আছে। তা আলোচনা করলেই বেড়িয়ে আসবে। প্রথম বর্ণটি হলো 'ই' অর্থাৎ ইবাদত, মহান আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি জ্বিন ও ইনসান সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। প্রত্যেক পূর্ণ কর্ম বা নেক আমল হলো একেকটি ইবাদত। মু'মিন মুসলমানের মধ্যে ইবাদতের মানকে সমুন্নত রাখা আবশ্যক। শুধুমাত্র মুখে ও লেবাসে ইসলাম, ইসলাম বললে চলবে না। ইসলামী অনুশাসন ও শিক্ষা নিজেদের আমলের দ্বারা ফুটিয়ে তুলতে হবে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেছেন, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম খাঁটি হয়, আল্লাহ্ তা দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন, সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অত:পর তার সৎকাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময়, সৎকাজ তার দশগুণ হবে যাতে শতগুণ বরং বহুগুণ আর অসৎ কাজ তার একগুণ মাত্র, তবে আল্লাহ্ যাকে ছেড়ে দেন (তার একগুণের শাস্তিও হবে না)' (বুখারী)। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ ইবাদতের মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভ করা সম্ভব। আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণই প্রকৃত ইসলাম।

ইসলাম ঈমানের দিকে পরিচালিত করে থাকে। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "সুতরাং পুণ্য কার্যের এমন দৃষ্টান্ত দেখাও যা হতে আর উৎকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত হওয়া সম্ভব নয়। তোমাদের মধ্যে কর্মে যে শীথিল হয়ে পড়বে তাকে ঘৃণিত দ্রব্যের ন্যায় মন্ডলী হতে বাইরে নিক্ষেপ করা হবে এবং আক্ষেপের সহিত তার জীবনের অবসান ঘটবে" (কিশতিয়ে নূহ্)। তাই প্রত্যেক আহমদীকে একথা স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যেন ইবাদত থেকে গাফেল না হয়ে পড়ি বরং পূর্বের তুলনায় আরও বেশী ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হই। তবেই আমরা খোদার দরবারে গ্রহণীয় হবো।

দ্বিতীয় বর্ণটি হলো 'স' সৎপথ, সরল ও সোজা পথ ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দোয়া শিখিয়েছেন, "ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকিম, সিরাতাল্লাযীনা আন আমতা আলাইহিম অর্থাৎ- তুমি আমাদেরকে সহজ সরল ও সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করো, তাদের পথে যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো। (সূরা ফাতেহা)।

সত্যবাদী পুরুষ-নারীদের মর্যাদা ও পুরস্কার সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন মজীদে বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। যেমন সূরা আহযাবের ৩৬ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, "মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী, আনুগত্য পুরুষ ও আনুগত্য নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থান সুরক্ষাকারী পুরুষ ও সুরক্ষকারী নারী এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও স্মরণকারী নারী এদের সবার জন্য আল্লাহ্ ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন। এই আয়াতটি ইসলামের বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন পুরুষ ও নারী আল্লাহ্ তা'লার ফযল লাভ করতে পারে। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা সত্য কথা বলো। কারণ সত্য পুণ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং পুণ্য বেহেশ্‌তের দিকে পরিচালিত করে। যে ব্যক্তি সত্য বলায় সর্বদা যত্নবান থাকে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে পরম সত্যবাদী" (বুখারী ও মুসলিম)।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "পৃথিবী সত্যবাদীকে দেখতে পারে না কিন্তু সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ সত্যবাদীকে দেখে থাকেন এবং তিনি নিজ হাতে তাদেরকে রক্ষা করেন" (বারাহীনে আহমদীয়া)।

তিনি (আ.) আরো বলেন, "ইসলাহে নফস বা আত্মশুদ্ধির জন্য একটি পথ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তা হল, "কুনু মায়াস সাদেকীন" অর্থাৎ যে সকল কথা ও কাজে এবং আত্মিক ও ব্যবহারিক সকল অবস্থায় সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাদের সাহচর্যে থাক। এর পূর্বে বলেছেন, অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর। এত্‌দ্বারা এই বুঝায় যে, সর্ব প্রথম ঈমান থাকতে হবে। অত:পর সুন্নত অনুযায়ী গোনাহের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করবে এবং সত্যবাদীদের সংস্বর্গে থাকবে। সংস্বর্গের প্রভাব অনেক বেশী হয়ে থাকে যা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ায় অজ্ঞাত ভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে" (মলফুযাত, ৬ষ্ঠ খন্ড)।

তৃতীয় বর্ণটি হলো 'লা' অর্থাৎ লোভ-লালসা যা মানুষকে খোদা হতে দূরে নিক্ষেপ করে। সূরা বাকারার ১৮৯ নম্বর আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, এবং তোমরা তোমাদের ধন-সম্পদ তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। লোভের তারণায় আমরা যেন একে অপরের ধন-সম্পদ অন্যায় ভাবে জবর-দখল না করি, এদিকে এ আয়াত আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করছে। হযরত উতবাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, তিনি একদা হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন, 'নাজাত কিরূপে পাওয়া যাবে? তিনি বললেন, 'জিহ্বাকে রোধ করবে। তোমার গৃহ তোমার জন্য যথেষ্ট হতে হবে, অর্থাৎ লালসা হতে বাঁচবে। যদি কোন ভুল ভ্রান্তি হয় তাতে অনুশোচনা ও অনুতাপসহ আল্লাহ্ তা'লার হুযূরে আকুল ভাবে ক্ষমাপ্রার্থী হবে" (তিরমিযী)।

এ যুগের মহাপুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) তাঁর লেখা পুস্তক কিশতিয়ে নূহ্‌তে বলেন, "সাবধান! তোমরা অন্যান্য জাতির ধন ও ঐশ্বর্য দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাদের পার্থিব উন্নতি দেখে তাদের কার্যকলাপের প্রতিযোগিতা করো না এবং তাদের পার্থিব উন্নতি দেখে প্রলুব্ধ হয়ে তাদের অনুসরণ করতে যেও না। শ্রবণ কর এবং স্মরণ রাখ যে, যারা তোমাদেরকে পবিত্র সম্পদের দিকে প্রলুব্ধ করছে তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন"।

ইসলাম শব্দের শেষ অক্ষর হচ্ছে 'ম' অর্থাৎ মু'মিন মুত্তাকী। পবিত্র কুরআন মজীদে বলা হয়েছে যে, বস্তুত মু'মিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের ওপর ঈমান আনে। অত:পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং নিজেদের ধন-সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যবাদী।

মু'মিনের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা পবিত্র কুরআন অধ্যায়নে অবগত হতে পারবো। এজন্য সর্বাদা আমাদেরকে কুরআন পাঠ করতে হবে যাতে আমরা কল্যাণ লাভ করতে পারি। এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সা.) বলেছেন, মু'মিন সরল ও দানশীল হয় আর পাপী ধুর্ত ও কাপুরুষ হয়" (আবু দাউদ, তিরমিযী)। অপর একটি হাদীসে এসেছে, "মু'মিনের মধ্যে দু'টি অভ্যাস একত্র হয় না প্রথমত কার্পণ্য দ্বিতীয়ত মন্দ আচরণ" (তিরমিযী)। মু'মিন সব সময় এ চিন্তা করবে যে, তার মাঝে যে সকল মন্দ আচরণ রয়েছে তা যেন দূরীভূত হয়, যার ফলে পূর্ণ কর্মের অভ্যাসে মন্দ কর্ম পলায়ণ করবে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন যে তার সকল সত্তাকে আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দেয় এবং নিজেকে সৎকর্মে নিয়োজিত রাখে" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে প্রকৃত ইসলামের অসুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

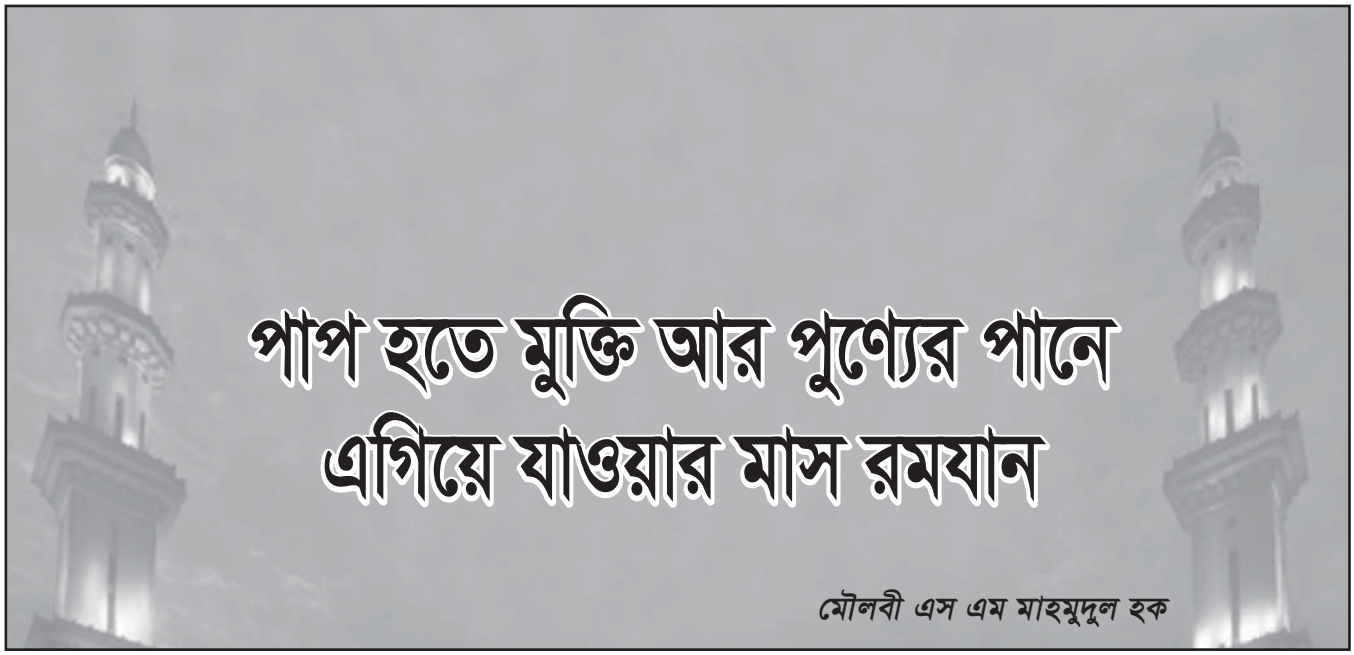

পাপ হতে মুক্তি আর পুণ্যের পানে এগিয়ে যাওয়ার মাস রমযান

মৌলবী এস এম মাহমুদুল হক

পবিত্র কুরআনে চান্দ্রমাস রমযানে সুবেহ্ সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা রাখার বিধান দেয়া হয়েছে। রোযা এমন একটি সাধনা যা মানুষের আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করে এবং একজন ইবাদতকারীর জন্য আধ্যাত্মিক উচ্চমার্গের সোপান সমূহ অতিক্রম করা সহজ সাধ্য করে। রোযাদার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার ঐশী অনুগ্রহরাজি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সেগুলোকে যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে রোযা তাকে সাহায্য করে। পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারার ১৮৮নং আল্লাহ্ তা'লা এরশাদ করেছেন–'এবং তোমরা আহার কর ও পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট ঊষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অত:পর রাত্রি (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর--।

পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রোযা কতক্ষণ রাখতে হবে, কিভাবে রাখতে হবে তা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, আকাশে দিনের আলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ ফজরের পূর্বে সেহরী খেতে হবে এবং রাত্রি আগমন পর্যন্ত অর্থাৎ সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করতে হবে।

পবিত্র ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মেও রোযা রাখা বা উপবাস থাকার রীতি ইতিহাস থেকে জানা যায়। কিন্তু সেসব ধর্মে উপবাস থাকার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য, ইসলামী রোযার মত পরিপূর্ণ নয়। আর তা হবার কথাও না। কেননা ইসলামই পৃথিবীর বুকে একমাত্র প্রতিষ্ঠিত মনোনীত ধর্ম যা সব বিষয়ে স্পষ্ট শিক্ষা উপস্থাপন করে এবং ইসলামের প্রত্যেকটি বিষয় এক মহান উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পাদন করা হয় যা মানবজীবনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আর এগুলি অবলম্বনের মাধ্যমে বান্দার সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে সুদৃঢ়তর হয়। নামায, কুরবানী, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেকটি পালনের মাধ্যমে বান্দার জন্য আধ্যাত্মিক, জাগতিক, পারলৌকিক অশেষ কল্যাণরাজি নিহত রয়েছে।

তেমনিভাবে আল্লাহ্ কর্তৃক যে রোযা আমাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে তারও কতগুলো মহান উদ্দেশ্য রয়েছে। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, রমযান মাসে শয়তানকে শিকল পড়ানো হয়, আর বান্দার জন্য জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়।

উপরোক্ত হাদীসের অর্থ কি? রমযান মাসে কি পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী মুসলমানরা কোন পাপ করে না! মদ, জুয়া, ঘুষ, চুরি, ডাকাতি সব অন্যায় কি এ মাসে মুসলিম সমাজ থেকে উঠে যায়?

প্রকৃত বিষয় হলো সার্বিক ভাবে পবিত্র রমযান মাসে পরিবারে, সমাজে, মুসলিম রাষ্ট্রে এমন একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ তৈরী হয় যার ফলে যে কোন মুসলমানের পক্ষে পুণ্যকর্ম করা সহজতর হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপা যে, তিনি দয়াপরবশত পবিত্র রমযান আমাদের জন্য রেখেছেন। যার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমানদেরকে এই সুযোগ দেয়া হয় তারা যেন আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সুদৃঢ় করে, পাপ হতে মুক্তি লাভ করে আর পুণ্যের পানে এগিয়ে যায়।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা রোযার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন– "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ওপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো, যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীগণের ওপর তা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরা বাকারা : ১৮৪)।

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা রোযার উদ্দেশ্য তাক্ওয়া বলে উল্লেখ করেছেন।

তাক্ওয়া কি? এ সম্পর্কে হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "তাকওয়া এমন এক বৃক্ষ যা হৃদয়ে রোপন করতে হবে। সেই পানি, যা দ্বারা তাক্ওয়া লালিত পালিত হয়, সমগ্র উদ্যানকে উর্বর করে দেয়। তাক্ওয়া এমন এক মূল যে, এটি না থাকলে সবই বৃথা এবং এটি বজায় থাকলে সবই বজায় থাকে। ঐ মানুষের বৃথা দাম্ভিকতায় কি লাভ, যে শুধু কথায় আল্লাহ্ অন্বেষণের দাবী করে, কিন্তু কদমে সিদক (সত্যের ওপরে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত) রাখে না" (আল ওসীয়্যত)।

সেই রোযাই প্রকৃত রোযা যা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও তার সন্তুষ্টি

অর্জনের লক্ষ্যে পালন করা হয়। যিনি রোযা পালন করেন তিনি কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য পানীয় হতেই বিরত থাকেন তেমন নয়, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কও কিছুটা ছিন্ন করে। রোযা পালনের মাধ্যমে একজন মু'মিন এ ঘোষণা দেন যে, প্রয়োজন বোধে তিনি তার প্রভূ ও সৃষ্টিকর্তার জন্য তার সব কিছু এমন কি তার জীবন পর্যন্ত কুরবানী দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত হবেন না।

এ হল একজন মু'মিনের জন্য রোযার চেতনা। যদি এই চেতনা এবং প্রেরণা নিয়ে রোযা রাখা হয় তাহলে এমন রোযা পালনকারীর জন্য আমাদের আকা ও মওলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে সুসংবাদ রয়েছে তিনি (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতার ও উত্তম ফল লাভের আশায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে" (বুখারী, মুসলিম)।

হাদীসে কুদসীতে আছে হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, মানুষের সব কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি তার জন্য তাকে পুরস্কৃত করব। একজন রোযাদার দু'টি আনন্দ লাভ করে, সে আনন্দিত হয় যখন সে রোযা ভাঙ্গে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভূর সাথে মিলিত হয়" (বুখারী ও মুসলিম)।

কেবলমাত্র উপবাস পালন করার নাম রোযা নয়। কেননা রোযা পালনকারীকে সর্বদা এ কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন আল্লাহ্‌র ভালবাসা, আত্ম সংশোধন, পবিত্রতা অর্জনই হল রোযার উদ্দেশ্য। আর যদি তা না হয় তাহলে এ উপবাস কোন কল্যাণ বয়ে আনতে সক্ষম হবে না।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যদি কোন রোযাদারকে কেউ গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে ঝগড়া করার চেষ্টা করে সে যেন বলে আমি রোযাদার" (বুখারী ও মুসলিম)।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "যে আমার জন্য পানাহার থেকে বিরত থেকেছে এবং রাগ দমন করেছে এবং যে আমার জন্য রোযা রেখেছে সুতরাং আমি তাকে পুরস্কৃত করব" (মেশকাত)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যদি কেউ মিথ্যা কথা বলে ও খারাপ আচরণ করে তার পানাহার পরিত্যাগ করায় আল্লাহ্‌র কোন আসে যায় না" (বুখারী)। সুতরাং রোযা পালনকারীকে অবশ্যই উপরোক্ত বিষয়গুলো দৃষ্টিতে রাখা প্রয়োজন।

যুগের ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন, "সুফীগণ লিখেছেন যে, এ মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার সুযোগ পাওয়া যায়। এর সাথে বহুল পরিমাণে কাশফ (দিব্যদর্শন) লাভ হয়ে থাকে। নামায তাসকিয়া-এ নাফস (আত্মশুদ্ধি) সাধন করে এবং রোযাতে তাযাল্লিয়ে কালব (আত্মার উজ্জলতা) সাধিত হয়। তাসকিয়ায়ে নাফসের অর্থ হল রাগ দমনের শক্তি পাওয়া এবং তাজাল্লিয়ে কালব সাধিত হবার অর্থ হল কাশফ বা দিব্য দর্শনের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ করা" (আল বদর, ১ম খন্ড)।

রোযার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আরও বলেন, "কেবল অভুক্ত এবং পিপাসার্ত থাকাই রোযার উদ্দেশ্য নয়। বরং এর একটি তাৎপর্য একটি প্রভাব আছে যা অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝা যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এটা নিহিত আছে যে, মানুষ যত কম খায় ততই তার আত্মশুদ্ধি ও কাশফী তাকৎ (দিব্যদর্শন শক্তি) সমূহ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় এটাই যে, একটি খাদ্যকে কম করে অপর একটি খাদ্যকে বর্ধিত করা। রোযাদারকে সর্বদাই এর প্রতি দৃষ্টি দেয়া কর্তব্য। আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণের মধ্যেই সময় কাটান উচিত, যেন সংসারের মোহ দূর হয় এবং আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করা যায়। অতএব, রোযার উদ্দেশ্য এটাই যে, মানুষ যেন এক খাদ্য ত্যাগ করে অন্য খাদ্য গ্রহণ করে যা আত্মার প্রশান্তি ও তৃপ্তির কারণ হয়। যে লোক শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই রোযা রাখে এবং অনুষ্ঠানের জন্য রোযা রাখে না তার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র হামদ, তসবীহ ও তাহলীলের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখে যাতে তার দ্বিতীয় খাদ্য লাভের সৌভাগ্য হয়" (আল হাকাম, ১৭ই জানুয়ারী ১৯০৭)।

মহান আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে তাক্‌ওয়ার সাথে রোযা পালন করার সৌভাগ্য দান করুন, যাতে করে রোযার মাধ্যমে আমাদের অতীত পাপ ধুয়ে মুছে আমরা পুণ্যের পানে এগিয়ে যেতে পারি, আমীন।

প্রকাশিত হয়েছে

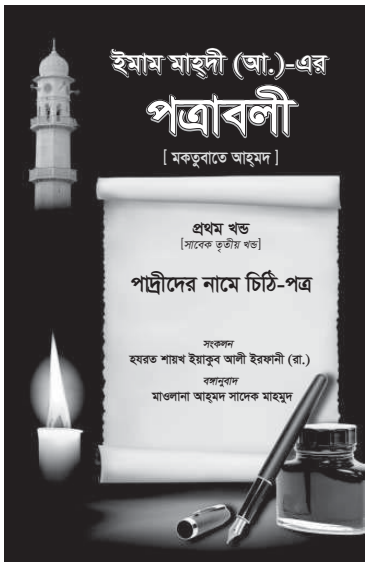

হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.) ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বিভিন্ন স্তরের লোকদের কাছে যেসব পত্রাবলী প্রেরণ করেছেন তার প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় অধ্যায় ও দ্বিতীয় খন্ডের প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ **"ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর পত্রাবলী"** নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

বঙ্গানুবাদ করেছেন **মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ**।

বই দু'টির মূল্য যথাক্রমে ৫০/- (পঞ্চাশ টাকা) এবং ৭৫/- (পচাত্তর টাকা)।

বই দু'টি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

ইতিকাফ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষা

রশিদ আহমদ
(জামেয়া আহমদীয়া, শাহেদ কোর্স উত্তীর্ণ)

ইতিকাফের আভিধানিক অর্থ কোন জায়গায় আবদ্ধ থাকা বা অবস্থান গ্রহণ করা। ইসলামি পরিভাষায়, "আল লাবছু ফিল মাসজিদে মাআস সাওমে ওয়া নিয়্যাতিল ইতিকাফে", অর্থাৎ ইবাদতের উদ্দেশ্যে মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করাকে ইতিকাফ বলা হয়। (হাদায়া, বাব-আল ইতিকাফ)

রোযার ন্যায় ইতিকাফের অস্তিত্ব অন্যান্য ধর্মে পরিলক্ষিত হয়। যেমন কুরআন করীমে বর্ণিত আছে, "ওয়া আহেদনা ইলা ইবরাহীমা ওয়া ইসমাঈলা আনতাহ্‌হীরা বাইতিয়া লিত্তায়েফীনা ওয়াল আকেফীনা ওয়া রুক্কাঈসসুজুদ।" অর্থাৎ আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে তাকিদপূর্ণ আদেশ দিয়েছিলাম যে, আমার ঘর (খানা কাবা)কে ত্বাওয়াফকারী, ইতিকাফকারী, রুকুকারী এবং সেজদাকারীদের জন্য পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখ। (সূরা বাকারা : ১২৬)

অনুরূপভাবে হযরত মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে এসেছে, হযরত মরিয়ম (আ.) কিছু কালের জন্য নিজ আত্মীয় স্বজন থেকে পৃথক হয়ে ইবাদতের উদ্দেশ্যে এক নির্জন জায়গায় চলে যান, সেখানে তিনি এক মহান পুত্রের শুভ সংবাদ লাভ করেন। (সূরা মরিয়ম : ১৭-১৮)

মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত লাভের পূর্বে পার্থিব বিষয়াদী থেকে বিমুখ হয়ে হেরা গুহায় খোদার স্মরণে রত থাকাও এক ধরণের ইতিকাফই ছিল। ইতিকাফ মানুষ যখন ইচ্ছা এবং যেই দিন ইচ্ছা বসতে পারে, তবে রমযানের শেষ দশকে এতেকাফে বসা মাসনুন (সুন্নত)।

হযরত রাসূল করীম (সা.) এর ইতিকাফ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.), তাঁর (সা.) মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত এই রীতিই বজায় রেখে ছিলেন যে, তিনি রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফে বসতেন। তাঁর (সা) মৃত্যুর পর তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ এই সুন্নতের অনুসরণ করেন। (বুখারী ও মুসলিম, কিতাবুল ইতিকাফ)

হযরত রাসূল করীম (সা.) লায়লাতুল কাদরের অন্বেষণকারীদের রমযানের শেষ দশকে ইতিকাফে বসার জন্য পরামর্শ দিতেন। হাদীসে এসেছে, হুযূর (সা.) বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে লায়লাতুল কাদর রমযানের শেষ দশকে বিদ্যমান। তোমাদের মধ্যে যারা ইতিকাফে বসতে চায় তারা এই শেষ দশকে বসুক। অত:পর সাহাবা (রা.) তাঁর (সা.) সাথে শেষ দশকে ইতিকাফে বসতেন। (মুসলিম, বাব- ফযলে লায়লাতুল কাদরে)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা রাসূল করীম (সা.) এর সাথে রমযানের দ্বিতীয় দশকে ইতিকাফে বসি। বিশ রমযানের সকাল বেলা আমরা এতেকাফ থেকে বের হয়ে আসি এই পরিপ্রেক্ষিতে হুযুর (সা.) আমাদেরকে বলেন, আমি স্বপ্নে লায়লাতুল কাদর দেখেছি, কিন্তু সেই দিনটির কথা আমার স্মরণ নাই। তবে এতটুকু স্মরণ আছে, আমি সেই রাতে পানি এবং কাদায় সেজদা করছি (অর্থাৎ সেই রাতে বৃষ্টি হবে)। সুতরাং তোমরা শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিগুলোতে লায়লাতুল কাদর অন্বেষণ কর। (বুখারী, বাবুল ইতিকাফ ও মুসলিম, ফাযলু লায়লাতিল কাদরে)

ইতিকাফের জন্য নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত করা নাই। এটি ইতিকাফকারীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। যতদিন ইচ্ছা বসতে পারে। (হাদায়া,পৃ-১৯০, ফিকাহ, মাযহাবে আরবা, ১ম খন্ড পৃ: ৯৪৬)

তবে মাসনুন ইতিকাফ যা রাসূল করীম (সা.) এর কর্মপন্থা দ্বারা সাব্যস্ত তা হলো কমপক্ষে ইতিকাফ দশ দিন হওয়া উচিত। হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযূর (সা.) রমযান মাসে সর্বদা দশ দিন ইতিকাফে বসতেন। তবে তিনি (সা.) তাঁর ওফাতের বছর বিশ দিন ইতিকাফে বসেছিলেন। (বুখারী, বাবুল ইতিকাফে ফিল আশরে)

ইতিকাফ বিশ রমযানের ফযর থেকে বসা উচিত, কেননা রাসূল করীম (সা.) সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে তিনি (সা.) দশদিন ইতিকাফ পালন করতেন। আর বিশে রমযানের ফযরের পর থেকে ইতিকাফে বসলে দশদিন পূর্ণ হয়।

হযরত রাসূল করীম (সা.) ফযর নামাযের পর ইতিকাফের জন্য নির্ধারিত হুজরাতে অবস্থান গ্রহণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) ইতিকাফের ইচ্ছা পোষণ করলে ফযর নামায আদায় করার পর নিজ হুজরাতে, যা এই উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হতো, প্রবেশ করতেন। (মুসলিম, বাব, মাতা ইয়াদখুলু মান আরাদাল ইতিকাফ) বুখারী শরীফেও প্রায় অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

ইতিকাফের উত্তম এবং উপযুক্ত স্থান হলো জামে মসজিদ। যেমন কুরআন মজীদে আছে, ওয়া আনতুম আকেফুনা ফিল মাসাজেদে, অর্থাৎ আর তোমরা মসজিদে ইতিকাফ অবস্থায় রয়েছ। (বাকারাহ : ১৮৮)।

কেননা মসজিদ হলো সেই স্থান যা শুধু মাত্র আল্লাহ্ তা'লার স্মরণ এবং ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। এছাড়াও হাদীসসমূহে মসজিদেই ইতিকাফে বসার তাকীদ করা হয়েছে। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, লা ইতিকাফা ইল্লা ফি মাসজিদিন জামেঈন। অর্থাৎ, জামে মসজিদ ছাড়া ইতিকাফ হয় না। (আবু দাউদ কিতাবুল ইতিকাফ)

তবে নিরূপায় অবস্থায় মসজিদের বাইরে ইতিকাফে বসা যেতে পারে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, "মসজিদের বাইরে ইতিকাফ হতে পারে। তবে মসজিদের সওয়াব অর্জিত হবে না।"

(আল ফযল, ৬ মার্চ ১৯৬২ইং)

মহিলারাও মসজিদে এতেকাফ করতে পারে, তবে ঘরে নামাযের জন্য আলাদা নির্দিষ্ট স্থান

নির্ধারণ করে সেখানে এতেকাফে বসা তার জন্য বেশী উত্তম। (হাদায়া, বাবুল এতেকাফে ১ম খন্ড পৃ: ১৯০)

ইতিকাফকারীর একান্ত জরুরী প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোন কারণে মসজিদ থেকে বাইরে যাওয়া উচিত নয়। এমনকি প্রাত্যহিক ধোয়া মুছা এবং চুল কাটানোর জন্যও মসজিদ থেকে বাইরে আসা উচিত নয়। তবে প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ যেমন, ওযু, দেহশুদ্ধির গোসলের জন্য মসজিদের বাইরে আসা শুধু উচিত নয় বরং আবশ্যকীয়। ইতিকাফ রত অবস্থায় যদি মহিলাদের ঋতুস্রাব শুরু হয় তাহলে তারা ইতিকাফ ত্যাগ করবে। এ অবস্থায় তার মসজিদে থাকা উচিত হবে না।

ইতিকাফকারী যিকরে এলাহী এবং ইবাদতে অধিক সময় ব্যয় করবে। বেহুদা কথাবার্তায় সময় নষ্ট করা শোভনীয় নয়। আবার একেবারে নিশ্চুপ থাকাও উচিত নয়। কেননা ইসলামে নীরব থেকে রোযা পালন করার কোন রীতি নাই। (হাদায়া, বাবুল এতেকাফে) সাধারণ অবস্থায় ইতিকাফের জন্য রোযা আবশ্যকীয় শর্ত। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'লা ইতিকাফা ইল্লা বেসাওমিন; রোযা ছাড়া কোন ইতিকাফ নাই। (আবুদাউদ, কিতাবুল ইতিকাফ)

ইতিকাফকারী সম্পূর্ণরূপে নিজেকে দুনিয়াবী কর্মকান্ড থেকে গুটিয়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। হাদীসে আছে, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন সুন্নত অর্থাৎ রাসূল করীম (সা.) এর পন্থা অনুযায়ী ইতিকাফকারী মসজিদ থেকে যেন বের না হয়, না কোন রোগীকে দেখতে যাওয়ার জন্য এবং না কোন জানাযায় শামিল হওয়ার জন্য। হ্যাঁ, অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারে আর অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের মানে হলো বাথরুমে যাওয়া। (আবুদাউদ কিতাবুস সিয়াম)

কেউ নিরুপায় হলে একান্ত বাধ্য হয়ে মহল্লার মসজিদে, যেখানে পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়, ইতিকাফে বসতে পারে। সে জুমুআর দিন জামে মসজিদে যেয়ে জুমুআর নামায আদায় করতে পারবে। অনুরূপভাবে বাড়ী থেকে খাবার নিয়ে আসতে এবং গোসল ও বাথরুমের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করতে পারবে। কিন্তু অযথা কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে সময় অপচয় করা মোটেই উচিত হবে না।

ইতিকাফের গুরুত্ব :

হযরত রাসূল করীম (সা.) ইতিকাফকারীর ফযিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, ইতিকাফকারী একনিষ্ঠ চিত্তে নিজেকে খোদার সমীপে সমর্পণ করে এবং বলে, হে খোদা! আমি তোমার নামে শপথ করছি, আমি এখান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হবো না, যে পর্যন্ত না তুমি আমার ওপর দয়া প্রদর্শন করবে। (দূররে মনসুর, পৃ-২০২, ১ম খন্ড, আয়াত ওয়া আনতুম আকেফুনা----)। আরও বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে একদিন ইতিকাফে বসে, তার এবং জাহান্নামের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা তিনটি এমন খন্দক তৈরী করে দিবেন যেগুলোর মাঝে পূর্ব থেকে পশ্চিমের যে দূরত্ব তার চেয়ে বেশী দূরত্ব বিদ্যমান থাকবে। (দূররে মনসুর-১ম খন্ড পৃ ২০২)।

আরও একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, হযরত রাসূল করীম (সা.) ইতিকাফকারী সম্পর্কে বলেন, ইতিকাফকারী ইতিকাফের দরুন সকল গুনাহ থেকে মুক্ত থাকে। সে সেই সমস্ত পুণ্যকর্মের প্রতিদান, যা সে ইতিকাফের পূর্বে সম্পাদন করেছিল। এমনভাবে ভোগ করতে থাকে যেন সে সেই পুণ্যকর্ম গুলো এখনও পালন করছে। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুল এতেকাফ) (তথ্যসূত্র-ফিকাহ্ আহমদীয়া ১ম খন্ড, পৃ: ৩০২-৩১৪)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সঠিক নিয়ম কানুন অনুযায়ী ইতিকাফ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা

●কনের বাড়ীতে বিবাহ ভোজ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, যদি মেয়ে পক্ষের সাধ্য ও সামর্থ থাকে তাহলে সীমিত গন্ডিতে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঋণ করে অন্যের দেখা-দেখি কখনও বড় ভোজের ব্যবস্থা করা উচিত নয়। সবকাজে তরবিয়তের দিকটা সামনে রাখা চাই। যাদের আর্থিক সামর্থ নেই তাদের কোনভাবেই হীনমন্যতায় ভোগা উচিত নয়।

●মেয়েদের চাকুরী করা সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, আমি এক্ষেত্রেও ঢালাওভাবে অনুমতি দেই না। যদি কোন উপায় না থাকে সেক্ষেত্রে মহিলা চাকুরী করতে পারেন কিন্তু তা-ও করতে হবে পর্দার ভেতর থেকে। কোনভাবেই পর্দার মান পদদলিত হতে দেয়া যাবে না।

●পর্দার শর্ত সাপেক্ষে সহশিক্ষার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু প্রত্যেককে ব্যক্তিগত ভাবে অনুমতি নিতে হবে।

●ফটো সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, বিয়ের জন্য যদি ফটো দিতে হয় দিন কিন্তু পরে তা ফেরত নিতে হবে। পত্রিকায় কোন আহমদী মহিলার ছবি ছাপা ঠিক হবে না।

এ বিষয়গুলো জামা'তের সর্বস্তরের সদস্যদের অবগতি ও প্রতিপালনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

[সূত্র : জি.এস/আমুজাবা/৭১৮, তারিখ: ২৫/১১/২০০৯]

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"ঈদ, শুধু আনন্দ-উৎসবের নাম নয় বরং ঈদ একটি ইবাদত"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

ঈদ, শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয় বরং ঈদ একটি ইবাদত

"ঈদ" শব্দটির অর্থ "যে খুশী বা আনন্দ বার বার আসে।" রোযাব্রত থাকা যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন তরীকায় উদযাপিত হয়ে আসছে তেমনি ঈদ উদযাপিত বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন পদ্ধতিতে পালিত হয়ে আসছে। আল্লাহ্ পাক মুসলমান জাতির জন্য দুটি ধর্মীয় উৎসব নির্ধারিত করে দিয়েছেন একটি হলো একমাস রোযা পালনের জন্য "ঈদ-উল-ফিতর" এবং দ্বিতীয়টি হলো হযরত ইসমাঈল (আ.) এর আত্মত্যাগের সম্মানের ও স্মরণে "ঈদ-উল-আযহিয়া বা কুরবানীর ঈদ"। এই দু'টি ঈদের নামায সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্ বা তাগিদকৃত সুন্নত এবং দু'টি উৎসবের বৃহদাংশ বা-জামাত নামাযের মাধ্যমে পড়তে হয়। আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ধর্মে যে ঈদের ব্যবস্থা রেখেছেন তার মধ্যে ধনীদের সঙ্গে দ্বীন দুঃখী অধিকার সর্বাগ্রে গণ্য করেছেন। ফিতরানা, ফিদিয়া, ও ঈদ-ফান্ড প্রভৃতি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে যেন দ্বীন ও দুঃখী মানুষ আর্থিকভাবে সুবিধা পায়। এসকল ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর মধ্যেই প্রকৃত ঈদের আনন্দ নিহিত! সম্প্রতিক খোতবার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি দরিদ্র ও কম সমর্থ্যবান আহমদীগণের সঙ্গে ঈদের মোলাকাতের সাথে কিছু তোহ্ফা সামগ্রী দিয়ে গেলে প্রকৃত ঈদের আনন্দ উপলব্ধি করা যাবে।

প্রকৃত ঈদ হলো নবীকুল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ঈদ। যে উদ্দেশ্যে তিনি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছেন সে উদ্দেশ্য যখন বাস্তবায়িত হবে তখনই হবে প্রকৃত ঈদ। ঈদ কুরআন ও ইসলাম বিস্তার হয় এবং মহানবী (সা.) এর শিক্ষা সমগ্র বিশ্বেও মানবজাতির ধনী-দরিদ্রেও মধ্যকার বৈষম্য দূর করার মধ্য দিয়ে। হযরত (সা.) ঈদ পালন করতেন এইজন্য যে তিনি খোদাকে পেয়েছিলেন। আর তাঁর সাহাবাগণ এইজন্য ঈদ পালন করতেন যে তাঁদের প্রভু অর্থাৎ খোদার বাদশাহাত পৃথিবীতে কায়েম হয়েছিল। তাঁর সম্পদ তারা লাভ করেছিল। কিন্তু আজ আমাদের হাতে সেই সম্পদ একটি একটি করে সুপ্ত হয়েছে! এখন মুসলিম জাতি সর্বাপেক্ষা অনুন্নত-জাতি হিসেবে গণ্য হয়েছে!! প্রকৃত ঈদ এটাই যখন বান্দা তার জীবন খোদার জন্য বিক্রী করে দেয়। খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চিন্তাই প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা করা আবশ্যক। মুসলিম উম্মাহ্র জন্য প্রকৃত ঈদ তখন হবে যখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে মেনে নিবে এবং বিশ্বের প্রতিটি কোন থেকে "আল্লাহু আকবার" ধ্বনি দ্বারা মুখরিত হয়ে উঠবে।

মুসলমানগণ কি এজন্য ঈদ-যাপন করে যে তাদের সম্পত্তি খোয়া গিয়েছে, তাদের ন্যায় বিচার নেই, ইনসাফের ভিত্তি নেই তাহলে কি কারণে তারা সন্তুষ্ট? শুধু কি নতুন পোশাক ও ভাল খাওয়াতেই খুশী? প্রথমে ঈদ মুসলমানদের জন্য পুরস্কারস্বরূপ ছিল কিন্তু বর্তমানে তা শাস্তিস্বরূপ! খোদার দরগাহে পতিত হয়ে আমাদের দূর্বলতা, অক্ষমতা প্রকাশপূর্বক তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তবে সত্যিই তা আমাদের ঈদ এবং আমরা আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) এর সম্মুখে চোখ মেলে তাকাবার যোগ্য হই। নইলে আমাদের ঈদ কিছু নয়, বরং প্রত্যেক ঈদ আমাদেরকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর করায় পরিণত করবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "সেই দিনটি কোনটি যা জুমুআ ও দুই ঈদের দিন ঐ তার আমলনামা ধুয়ে পরিষ্কার করে দেয়া হয়।" রমযানে যদি সত্যিকার তওবা করতে সক্ষম হই তাহলে রমযানের প্রতিটি দিনই হবে আমাদের ঈদের দিন। মহান আল্লাহ্ তা'লা সকলের রোযা কবুল করে প্রকৃত ঈদের সৌভাগ্য দান করুন এবং আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে "ঈদ" উদযাপন করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

ঈদের আনন্দ হচ্ছে ইবাদত

মাহে রমযান পবিত্র সিয়াম সাধনার মাস। পবিত্র রমযান মাস আমাদের জন্য অঢেল ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ নিয়ে আসে। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মু'মিন বান্দারা অন্বেষণ করে খোদা তাআলার নৈকট্য লাভের। রোযার মাহাত্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। দীর্ঘ একমাস রোযা রাখার পর মু'মিন মুত্তাকিদের জন্য আসে একটি আনন্দের দিন। সেই দিনটি হচ্ছে ঈদ। আর ঈদ শব্দটির অর্থ হচ্ছে খুশি যা আনন্দ। খুশি বা আনন্দের মাঝেই ঈদ শব্দটি সীমাবদ্ধ থাকে না কারণ ঈদ একটি বড় ইবাদত। ঈদকে আমরা অনেকেই বুঝে থাকি নতুন জামা কাপড় আর নানান রকমের খাবার। প্রকৃত অর্থে এটা মূলত ঈদ নয় কারণ ঈদ হচ্ছে নিজের সুখ দুঃখকে গরীব অসহায়দের সাথে ভাগ করে নেওয়া। আমাদের আশে পাশে অনেক গরীব অসহায়রা থাকে যারা ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। আমাদের উচিত

আমরা যেন তাদের পাশে দাঁড়াই। আমাদের প্রত্যেক ক্ষেত্রে রাসূল করীম (সা.) এর আদর্শের কথা মনে রাখা উচিত। রসূল করীম (সা.) যেখানে বলেছেন তোমাদের তরকারীতে ঝোল বেশী করে দিয়েও প্রতিবেশী বা গরীবদের হক আদায় কর। তবে আমরা কেন ঈদের আনন্দটুকু থেকে তাদের আলাদা করে দিব। আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দা হতে হলে তার আদর্শের ছোট থেকে ছোট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থাৎ আমি জ্বিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর ঈদের আনন্দ গরীবদের মাঝে নিজের আনন্দটাকে বিলিন করাও ইবাদতের শামীল। অনেকে আছেন আনন্দ উৎসবের মাঝে নিজেকে এভাবে জড়িয়ে রাখেন যে, নিজের গরীব ভাই, বোনদের কথা একবারের জন্যও মনে করে না। এটা প্রকৃত ঈমানদার বা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুসারী হতে পারে না। আমাদের আহমদীদেরকে প্রকৃত ইবাদতের প্রতি ঝুকে থাকা উচিত। তবেই আল্লাহ্ তা'লার প্রিয় বান্দা হতে পারবো। আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের জন্য তার বান্দার প্রতি সদয় হওয়া উচিত। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই মনে রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে সেই তৌফিক দান করুন, আমরা যেন সঠিকভাবে এই পবিত্র ঈদ যেন ইবাদতগুজারে অতিবাহিত করতে পারি। হে আল্লাহ্ আমাদেরকে ঈদের মাধ্যমে ইবাদতের সীমাহীন কল্যাণ প্রদান কর। আমাদেরকে প্রত্যেক অনিষ্ট, মন্দ থেকে বাঁচাও আর তোমার রহমতের ফজলের আবরণের মধ্যে চিরদিন আবৃত করে রাখ, আমীন।

লাকী আহমদ, তেবাড়ীয়া, নাটোর

সবার সাথে আনন্দ ভাগ করে নেয়ার নামই ঈদ

সারা বছরে পানাহারের পর একটি মাস আসে পানাহার বর্জনের সময় যার নাম রোযা। রোযা রাখা হয় আল্লাহ্ তা'লার জন্য এর ফল স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই বান্দাদের দিয়ে থাকেন। প্রকৃত রোযাদার ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা পুরস্কারে ভূষিত করেন। রোযাদার ব্যক্তি মুখের গন্ধ আল্লাহ্ তআলার নিকট কস্তুরীর গন্ধের চেয়েও প্রিয়। রোযা থেকে আমরা আত্মসংযমী, ধৈর্য, দানশীলতা, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত বন্দেগী করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাল কাজের প্রেরণা পাই। আর বিভিন্ন মন্দ কাজ যেমন মিথ্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি বিভিন্ন নানা অপকর্ম থেকে আমরা দূরে থাকি। এভাবে এ মাসের শিক্ষাকে সারা বছর স্থায়ীভাবে জীবনে প্রতিফলন ঘটাতে পারাটাই স্বার্থকতা। এটিই প্রকৃত রোযাদার ব্যক্তিরা করে থাকেন। প্রকৃত রোযাদার ব্যক্তি অন্যান্য সময় আল্লাহ্‌র রাস্তায় যতটা না খরচ করে রোযার সময় চেষ্টা করে তার চেয়ে আরো বেশি যেন খরচ করতে পারে।

এক মাস রোযার পর আসে ঈদ। ঈদের আনন্দ সবাই সবার সাথে ভাগ করে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু ঈদ কি শুধু উৎসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না ইবাদতও? যে ঈমানদার ব্যক্তি সুখে-দুঃখে সারা বছর মহান আল্লাহ্ তা'লার শোকর গুযার করে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তাঁর ইবাদত করে এবং যখন রোযা আসে এবং সে রোযা রাখে আল্লাহ্ তাআলার জন্য আর সাধ্যমত আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করে, এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে তার ঈদ শুধু আনন্দই দেবে না বরং ইবাদতে রূপান্তরিত হবে।

যারা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও রমযান মাসে রোযা রাখে না সে কি করে ভাল গুণের অধিকারী হবে। যে ব্যক্তি রমযানে রোযা রাখে না এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত ঠিকভাবে করে না সে সারা বছরে অন্যান্য সময়ও আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত করে না। রোযা রাখার পর, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত বন্দেগীর পর একদিন আসে ঈদুল ফিতর এই ঈদে গরীব ধনী সবাই এক হয়ে ঈদ উদযাপন করে আনন্দের সাথে। কিন্তু কিছু মানুষ আছে যারা ঈদকে আনন্দ উৎসব ভেবেই সারা রোযার মাস আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত না করে শুধু ব্যস্ত থাকে কেনাকাটা নিয়ে। তাদের ঈদ কি প্রকৃত ঈদ? এ ঈদ তাদের জন্য কি কোন কল্যাণ নিয়ে আসবে? তারা হৈ হুল্লোর, দামী জামা-কাপড় নিয়েই ঈদে ব্যস্ত থাকে, ইবাদত করার চিন্তাও তাদের মনে আসে না।

মু'মিন রোযাদার ব্যক্তি সারা বছর এই একটা মাসের অপেক্ষা করে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতে কাটানোর জন্য। আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জন্য সে রোযা রাখে আর আল্লাহ্ তা'লাই রোযার প্রতিদান দিয়ে থাকেন। মু'মিন বান্দা শুধু রমযান মাসেই আল্লাহ্‌র ইবাদত করে না সে সারা বছরের প্রতিটি দিনই আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটায়। এমনকি রমযানের পর যে খুশির ঈদ আসে তাতেও মু'মিন বান্দা ইবাদত করতে বা খোদাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় না। এমনকি ঈদকে সে হাসি তামাশায়, আনন্দে ভরপুর না করে ইবাদত বন্দেগীতে কাটানোর চেষ্টা করে। যদিও ঈদ আনন্দেরই দিন। তবে মু'মিন ব্যক্তির ঈদই প্রকৃত আনন্দের ঈদ। যে আনন্দে মহান আল্লাহ্ তা'লার শোকর গুজার হয় না তা কেমন আনন্দ? নিছক শুধু আনন্দ কোন কাজে আসবে কি?

মহান আল্লাহ্ তা'লা করুন আমরা সবাই যেন তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে রমযান মাস শেষ করে ঈদের খুশিকে বরণ করতে পারি।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী, তেজগাঁও, ঢাকা

আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্যকারীর জন্য প্রত্যেক দিনই ঈদ

ঈদ কি? ঈদ মানে আনন্দ, খুশি বা উৎসব। ঈদের কথা শুনলে ছোট বড় সবার মাঝে কেমন যে আনন্দ বয়ে যায়। মুসলমানদের জাতীয় জীবনে ঈদ বার বার আসে। মু'মিন মুসলমানদের জন্য ঈদের দিন অত্যন্ত পুণ্যময়। এ দিন ইবাদতের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

ঈদের দিন এমন একটি দিন যা অন্য দিন থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। এদিন বিশ্ব মুসলিম পরস্পর হিংসা বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ঈদগাহে যায় এবং ঈদের মাঠে ছোট বড়, ধনী, গরীব, আমীর-ফকির একই কাতারে দাঁড়িয়ে বিশেষ ইবাদত করে থাকে।

ঈদ শুধু আনন্দ উৎসবের নাম নয় বরং মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে মুসলিম মিল্লাতের জন্য একটি বিশেষ

রহমত ও আল্লাহ্‌র দেয়া আদেশ, যার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি। অন্য কথায় ঈদ হলো তাক্‌ওয়া ও ত্যাগের মহিমার সাফল্যের বিজয়ের প্রতীক ও আনন্দের দ্যোতক বলা যায়, আল্লাহ্‌ এ রসূল (সা.) এর অপছন্দনীয় সকল কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সারা মাস রোযা থাকার ফলে হৃদয় থেকে যে আনন্দ বের হয়ে আসে তা-ই প্রকৃত ঈদ।

ঈদ আমাদের এ নিয়্যতে উদযাপন করা উচিত, যাতে আমাদে সৃষ্টিকারী খোদার সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে, খোদার ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি থাকে। শুধু আনন্দ, হৈ-হুল্লা দিয়ে ঈদ উদযাপন করা উচিত নয়।

যে আল্লাহ্‌ তা'লার আনুগত্যকারী হয়ে যাবে তার প্রত্যেকটি দিনই ঈদ হবে। প্রকৃত ঈদের প্রকৃত অর্থ হলো পুত:পবিত্র পরিবর্তনের অঙ্গীকারের ওপর কর্মসম্পাদন শুরু করে দেয়া। নামায প্রতিষ্ঠাকারী এবং পূত:পবিত্রতা চিরস্থায়ীভাবে অবলম্বনকারীদের জন্যই প্রকৃত ঈদ হয়ে থাকে।

ঈদ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ সানী (রা.) ঈদুল ফিতরের এক খুতবায় বলেন, "যে ব্যক্তি ঈদের নামায পড়েছে, কিন্তু তার অন্তরে ইসলামের জন্য দরদ সৃষ্টি হয়নি, সেক্ষেত্রে তার অন্তর মৃত। তেমনি যে ব্যক্তি ঈদ উদযাপন করলো না তার অন্তরও মৃত। প্রকৃত ঈদ সে ব্যক্তিরই হবে, যে স্ববিরোধী আবেগ অনুভূতি নিয়ে ঈদ উদযাপন করে, তার অন্তর বিলাপ করে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা ঈদ উদযাপন করে।"

আল্লাহ্‌ পাক আমাদের সবাইকে উক্ত বিষয়গুলো সামনে রেখে পবিত্র ঈদের আনন্দ উপভোগ করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

ইউমনা বুশরা, শ্যামপুর, রংপুর

পরিবারেই যথা সাধ্য বিভিন্ন প্রকার উত্তম খাবার প্রস্তুত করা হয় এবং আত্মীয় স্বজন ছাড়া প্রতিবেশী ও গরীব মিসকিনদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর এসবই করা হয় আল্লাহ্‌ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের ভালবাসায়। অতএব এই যে খুশী এটা শুধু আনন্দ উৎসব নয় এটা ইবাদত বটে।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বরচর

ঈদ একটি ইবাদত

আল্লাহ্‌ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সাথে মিলন ও তার ভালবাসা লাভ করা। আর তা গোটা কয় ব্যক্তি বা সমাজের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। সমগ্র মানবকুলই এ অনুগ্রহের আওতাভুক্ত। ধর্মকে মানবজীবনে বাস্তবায়ন করতে হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন এক পরিপূর্ণ রসূল যার শিক্ষার ব্যপ্তি সমগ্র বিশ্বব্যাপী, তিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমাতুল্লিল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের জন্যই রহমত।

তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত যেমন করে অন্যান্য নবী রাসূলরা ও আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রেরিত তবে, আঁ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বৈশিষ্ট ও ভবিষ্যতের যাবতীয় শিক্ষাকে মৌলিকভাবে তার মধ্যে ধারণ করেছেন আর এ বৈশিষ্টের কারণে তিনি খাতামান্‌ নবীঈন।

অতীতের শিক্ষা ও তাঁর শিক্ষা হতে নেওয়া, ভবিষ্যতের শিক্ষাও তাঁর শিক্ষারই অধীন। যেহেতু পবিত্র কুরআন তথা রাসূল (সা.) এর শিক্ষা পরিপূর্ণ জীবন বিধান তাই ইসলামী জীবনের যাবতীয় আচার আচরণ পরিপূর্ণ জীবনের যাবতীয় ও সুন্দরতম ব্যপ্তিতে দীপ্তিমান। ইসলামী ব্যবস্থায় প্রত্যেক কাজেই ইবাদত, তা যতই ছোট হোক না কেন। ইসলামী শিক্ষা কর্মে মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে সর্বদাই সক্রিয়। মুসলমান শুধু নিজ জীবনেই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হয় না, নিজ পরিবার, সমাজ এবং ক্ষেত্র বিশেষে সমগ্র বিশ্বকে সম্পৃক্ত করে আনন্দ সুন্দর ব্যবস্থার আওতার স্বর্গীয় জীবন যাত্রা সূচনা করে।

আমরা যদি পবিত্র রমযান শেষে যে ঈদ উদযাপন করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি দেই তবে দেখতে পাই যে প্রথম দিন থেকেই বা তার আগ থেকেই প্রতিবেশী এবং গরীব মিসকিনকে সম্পৃক্ত করে তার যাত্রা শুরু হয়। গরীবের অভাব পূরণে যথাসাধ্য সাহায্য সদকা, ফিদিয়া, যাকাত প্রদান এবং পরস্পর এটা সেটা আদান প্রদানের মাধ্যমে এক অনুপম ভ্রাতৃত্ববন্ধন সুদৃঢ় করা শুরু হয়।

রমযান শেষে মু'মিনরা দলে দলে মসজিদে বা ঈদগাতে সমবেত হয় এবং সুদীর্ঘ একমাস সিয়াম সাধনায় সবাই মিলে এক হয়ে একক সত্তার নিকট বিনত হয়ে ঈদের নামায আদায় করে এবং পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময় কোলাকোলি করে। প্রত্যেক

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাক্ষিক আহমদী'তে প্রতি মাসের শেষ সংখ্যায় পাঠকদের লেখা নিয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে **'পাঠক কলাম'**।

আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"ইসলামে নারীর অবদান"

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে। লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ আগস্ট, ২০১৩-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com

সংবাদ

শৈলমারী জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ৩০/০৬/২০১৩ তারিখ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারি মসজিদ প্রাঙ্গনে জনাব সালেহ উদ্দিন, স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে এক বিশেষ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩ ঘটিকার হতে শুরু করে বিকাল ৬টা পর্যন্ত চলে। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব হুমায়ুন কবির। ঈদে মিলাদুন নবী (সা.) নযম পাঠ করেন জনাব শাহীনুর রহমান। বক্তৃতা পর্বে : হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সীরাতের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোজাফ্‌ফর আহমদ রাজু। আহমদীয়া জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতার দৃষ্টিতে হযরত নবী করীম (সা.) নিয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ। উক্ত সীরাতুন নবী (সা.) শৈলমারী ও উথলী জামা'তের মেহমানদের সমন্বয়ে করা হয়। শৈলমারী জামা'তের ২৫ জন মেহমান উথলী জামা'তের ২২ জন মেহমান মোট ৪৭ জন মেহমান উপস্থিতিতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষে এক ঘন্টা মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হয়। সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সর্বমোট ৬২ জন উপস্থিত ছিলেন।

সালেহ উদ্দিন

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌, ঢাকার উদ্যোগে স্বাস্থ্য সেবা দিবস পালিত

প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও গত ০৫/০৭/২০১৩ বাদ জুমুআ দারুত তবলীগ মসজিদে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার ওপরে একটি ভিডিও Presentation দেন পাকিস্তান থেকে আগত United Nations বাংলাদেশ এর বিশিষ্ট Physician ডাক্তার শরীফ আহমদ কাওকাফ সাহেব। তিনি ৩৫ মিনিটের ১টি Presentation দেন যেখানে তিনি বলেন প্রত্যেক মানুষেরই প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিষয়ের ওপর কিছু না কিছু ধারণা থাকা দরকার। একটি মানুষ যে কোন সময়ে যে কোন জায়গায় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে। তার পার্শ্বে যারা থাকবে তাদের তখনই কিছু না কিছু করা দরকার। সেই সময় তিনি কি করবেন এই সমস্ত বিষয় কিছু না কিছু জ্ঞান থাকা দরকার। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি তার বক্তৃতায় হঠাৎ একটি মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়লে বা বুকে ব্যথা অনুভব করলে ঐ রুগীর জন্য প্রাথমিকভাবে কি করা উচিত তা বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

তিনি বলেন, মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়লে তাকে ৪-৮ মিনিটের মধ্যে বুকে পাঞ্জ করতে হবে মিনিটে ১০০ বার মুখের চোয়াল উঁচু করে মুখে মুখ রেখে ফুঁ দিতে হবে। এতে করে তার বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরে পাবে এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে। অজ্ঞান হয়ে মুখে খীল ধরে গেলে মুখ ফাঁক করে দিতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করতে হবে। তিনি এসব কিভাবে করতে হবে তা তিনি পর্দায় সবাইকে দেখান। সময় স্বল্পতার কারণে ১টি বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন। পরবর্তীতে তিনি আগুনে পুড়ে গেলে কি করতে হবে। Accident করলে পা হাত ভেঙ্গে গেলে কি করতে হবে আরও বিভিন্ন বিষয়ের ওপর দিবেন বলে সকলকে জানান। বিষয়টি সকলে খুব ভালভাবে শুনেন এবং শুনে উপকৃত হন। তার বক্তৃতা তিনি ইংরেজী ভাষায় প্রদান করেন, সাথে সাথে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর মোবাশশেরউর রহমান ও আহমদ তবশীর চৌধুরী তাঁর বক্তৃতা বাংলায় অনুবাদ করেন। উক্ত স্বাস্থ্য সেবা অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম

বানিয়াজান

গত ২৫/৫/২০১৩ মঙ্গলবার বাদ মাগরিব থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সীরাতুন নবী (সা.) করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্‌। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ও নযম পাঠ করেন জনাব মঞ্জুর আহমদ। বর্তমানে অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন এবং মানবজাতির নৈতিক অবক্ষয় থেকে একমাত্র উত্তরণের উপায় হলো বিশ্বনবী শ্রেষ্ঠনবী, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পবিত্র জীবনের অনুসরণ করা। উল্লেখিত বিষয়ের উপরে বক্তৃতা করেন জনাব আব্দুল বারি, জনাব খালিদ আহমদ, জনাব মুজাফ্‌ফর আহমদ, মৌ. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান এবং মওলানা রবিউল ইসলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪৫ জন গয়ের মেহমানসহ ২০ জন আহমদীসহ মোট ৬৫ জন উপস্থিত ছিলেন। পরিশেষে প্রশ্নোত্তর আহ্বান করা হয়। দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

তবলীগি সেমিনার

মোহতরম মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেবের নির্দেশক্রমে ০৪/০৭/২০১৩ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বানিয়াজানে এক তবলীগি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন মৌ. রাজিব আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব মঞ্জুর আহমদ। মেহমানদের পরিচিতি পর্ব বক্তৃতা করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম মৌ. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান। নবী (সা.) এর জীবনীর জীবনী আদর্শ নিয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা রবিউল ইসলাম। জামালপুর অঞ্চল এবং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জনাব আলহাজ্জ নূর মোহাম্মদ।

এরপর নবী (সা.) এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ বক্তৃতা করেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী সাহেব। এরপর প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হয়। আগত মেহমানদের নানাবিধ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। প্রশ্ন উত্তর পূর্বে মেহমানদের মধ্যে অত্যন্ত উচ্ছাস ও আবেগ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। বানিয়াজান জামা'তের দু'টি হালকা একটি গংগাবর অপরটি পঁঞ্চাশী। গংগাবর থেকে ১০/১২ জন পঁঞ্চাশী থেকে প্রায় ৪০/৫০ জন মেহমান অংশগ্রহণ করেন বানিয়াজান অঞ্চলের অন্যান্য জায়গা থেকে বটতলী, কাইয়াপাড়া, নয়াপড়া, সোনারপাড়া, বাসষ্ট্যান্ট থেকে আরো ৩৫/৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। মোট সংখ্যা ১২৭ জন মেহমান সংখ্যা ১০৫। সবশেষে সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ মিজানুর রহমান

১২তম বিভাগীয় ওয়াকফে নও সম্মেলন ও ক্লাস ২০১৩ইং চট্টগ্রাম অনুষ্ঠিত

গত ২৫/০৬/২০১৩ হতে ২৮/০৬/২০১৩ রোজ মঙ্গলবার সকাল ৯টা হতে শুক্রবার বা জুমুআ পর্যন্ত মসজিদ বায়তুল বাসেত চট্টগ্রামে ৪দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও সম্মেলন ও ক্লাস ২০১৩ চট্টগ্রাম বিভাগের শুভ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত চট্টগ্রামের আমীর জনাব অধ্যক্ষ মোনেম বিল্লাহ, উক্ত অনুষ্ঠানে তেলাওয়াতে কুরআন পড়েন রাসেল আহমদ শাবাব এবং নযম পাঠ করেন মাহমুদ আহমদ সানি। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শুভেচ্ছা ও উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন সম্মেলনের চেয়ারম্যান জনাব সাহাবউদ্দিন শিহাব। ওয়াকফে নও এর পটভূমি নিয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন মুহাম্মদ আরিফুজ্জামান।

এরপর মওলানা আব্দুল মতিন নসিহত মূলক বক্তব্য রাখেন, এছাড়া আনসারুল্লাহ্ যয়ীমে আলা এবং ওয়াকফে নও সম্মেলনের সেক্রেটারী জনাব মঈন আল হোসাইনী অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে জ্ঞানগর্ভ ও নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। এরপর জামা'তের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নেছার আহমদ সকল ওয়াকফে নও ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোকপাত করেন।

সভাপতি সকলের উদ্দেশ্যে নসিহতমূলক বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিদিন উক্ত ক্লাসসমূহ পরিচালনা করেন : মওলানা আব্দুল মতিন, জনাব মোনেম বিল্লাহ্ (আমীর চট্টগ্রাম), মৌ. দেলোয়ার হোসেন, জনাব আনোয়ার আহমদ, জনাব আবুল খায়ের, জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান, জনাব সৈয়দ আমীন আহমদ এবং জনাব হাফেজ নিজাম উদ্দিন।

উক্ত অনুষ্ঠানে গড়ে ৪৫ জন ওয়াকফে নও ছেলেমেয়ে এবং তাদের পিতা/মাতা অংশগ্রহণ করেন। সার্বিক ক্লাস পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সেক্রেটারী ওয়াকফে নও চট্টগ্রাম, জনাব মোহাম্মদ আরিফুজ্জামান। প্রতিদিন কুরআন, হাদীস, নযম, নামায বক্তৃতা ধর্মীয় পুস্তক আলোচনা উর্দু শিক্ষা ইত্যাদি ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ২৮/০৬/২০১৩ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ জনাব আমীর চট্টগ্রাম-এর সভাপতিত্বে এবং উনার মূল্যবান উপদেশমূলক ভাষণের শেষে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ এবং দোয়ার মাধ্যমে ১২তম ওয়াকফে নও ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মঈন আল হোসাইনী

১২তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস ব্রাহ্মণবাড়িয়া-সিলেট রিজিওনে সফলতার সাথে সম্পন্ন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রিজিওনের ৬দিন ব্যাপী ১২তম রিজিওনাল ওয়াকফে নও ক্লাস-২০১৩ গত ২৩ শে মে ২০১৩ পর্যন্ত আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। ২৩ শে মে ২০১৩ তারিখ মোস্তাক আহমদ খন্দকার সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় এবং ২৮শে মে হালিম আহমদ হাজারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওয়াকফে নও এর সভাপতিত্বে ক্লাস ও সম্মেলনের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। এ সময় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জ্ঞানগর্ভ ও নসিহতমূলক বক্তব্য দেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আমীর জনাব মঞ্জুর হোসেন। ওয়াকফ কি এবং কেন এ বিষয়ে বক্তৃতা দেন মওলানা শামসুদ্দিন মাসুম। এছাড়া ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের উদ্দেশ্যে আলোচনায় অংশ নেন মৌ. আসাদুল্লাহ আসাদ, মৌ. এনামুল হক রনি, মৌ. মাহমুদ আহমদ আনসারী। ৬ দিন ব্যাপী ওয়াকফে নও পিতা-মাতাদের বিভিন্ন ক্লাসে পাঠদান করেন, ক্লাসের বিষয় ছিল; কুরআন ক্লাস (মুখস্ত), অর্থসহ নামায, হাদিস শিক্ষা, আযান ইকামত, নযম বাংলা, উর্দু বক্তৃতা, দ্বীনি মালুমাত, পুস্তক আলোচনা ইত্যাদি। এ ছাড়া আকর্ষণীয় ক্লাস ছিল উর্দু শিক্ষার ক্লাস। এছাড়া ১৮ জানুয়ারী/১৩ তারিখ হযরত আকদাস (আই.) ওয়াকফে নওদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ছিল এবারের ক্লাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খোৎবার ওপর বিশেষ ক্লাস পরীক্ষা নেওয়া হয়। পাঠদান কর্মসূচীর শেষে ওয়াকফে নও এবং পিতামাতাদের বিষয়গুলোর ওপর পরীক্ষা নেয়া হয় এবং প্রথম দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। উক্ত মহতী ক্লাসে অত্র রিজিওনের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ঘাটুরা, তারুয়া, তালশহর, ক্রোড়া, দুর্গারামপুর, আখাউড়া, জামালপুর মোট ৮টি জামা'তের ৬০ জন ওয়াকফে নও এবং ২০ জন পিতা-মাতা উপস্থিত থেকে ক্লাস করেছেন।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

কুমিল্লা জামা'তে খেলাফত দিবস উদযাপন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কুমিল্লার উদ্যোগে গত ৩১/০৫/২০১৩ বাদ জুমুআ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট এর সভাপতিত্বে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়।

দিবসের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সোহাগ আহমদ, নযম পাঠ করেন জনাব হেলাল আহমদ, খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করেন মৌ. মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম

মজলিস আনসারুল্লাহ্ শালশিড়ি

গত ১৪ জুন রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ শালশিড়ি জামা'তে খেলাফত দিবস পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত খেলাফত দিবসে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুল হাফিজ হক, যয়ীমে আলা। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শহীদ আহমদ তালুকদার। নযম পরিবেশন করেন জনাব ইসরাঈল দেওয়ান। অত:পর ইসলামে খেলাফতের কল্যাণ, খলীফার আনুগত্য এই বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাফিজ মীর। সর্বশেষ সভাপতির গুরুত্বপূর্ণ সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

আব্দুল হাফিজ হক

তারুয়া জামা'তে আমীন অনুষ্ঠান

গত ০৭ জুলাই রবিবার তারুয়া জামা'তে "মসজিদে বাশারত" মক্তবে 'আমীন অনুষ্ঠানের' আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসু মিয়া। মক্তব্যের ছাত্র-ছাত্রী প্রথমবার কুরআন খতমকারীরা হচ্ছেন (১) শ্রাবনী আক্তার (২) অয়ন আহমদ (৩) অয়ন্তী বেগম (৪) রবিন আহমদ। এতে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জামা'তের তালিম সেক্রেটারী জনাব ফজলুল হক মোল্লা, জেনারেল সেক্রেটারী জনাব জহির আহমদ মিয়াজী ও মক্তব্যের শিক্ষক জনাব মিজানুর রহমান। সবশেষে মৌ. এনামুল হক রনি, মোয়াল্লেম আমিন অনুষ্ঠানের গুরুত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। এই অনুষ্ঠানে মক্তবের ৪০ জন ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির পুরস্কার বিতরণ শেষে দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

এনামুল হক রনি

হেলেঞ্চাকুড়ি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত হেলেঞ্চাকুড়ি মসজিদে গত ৩১ মে বাদ জুমুআ খেলাফত দিবসের আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব আলমাছ হোসেন খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন মারুফ আহমদ। মাসরূর আলম প্রভাত দলনেতার অধীনে কোরাস নযম পরিবেশন করা হয়। খেলাফত দিবস কি, কেন ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব ও কল্যাণ, খলীফার হাতকে শক্তিশালী করার গুরুত্ব বিষয়ে বক্তৃতাদান করেন সর্বজনাব একে এম,নূরুল ইসলাম খান, মৌ. শাহ্ আলম খান। সবশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

শাহ্ আলম খান

তারুয়ায় জামা'তী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ৮ই জুলাই সোমবার বাদ মাগরিব তারুয়া জামা'তের মসজিদ বাশারতে, জামা'তের অফিসে (কর্মকর্ত সেক্রেটারী) নিয়ে কর্মশালা'র আয়োজন করা হয়। এতে জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব শামসু মিয়া সভাপতিত্ব করেন। শুরুতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মিজানুর রহমান, সেক্রেটারী তরবিয়ত ও ওসীয়্যত। তারপর দোয়ার মাধ্যমে দুই পর্বে কর্মশালা শুরু হয়- যথাক্রমে সাধারণ বিষয় ও অর্থ বিষয়ে। সাধারণ বিষয়ে আলোচনা করেন : জামা'তের সাবেক জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শফিউল আজম শশী, বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারী জহির আহমদ মিয়াজী ও মৌ. এনামুল হক রনি। অর্থ বিষয়ে আলোচনা করেন এডিশনাল মাল জনাব খলিল আহমদ ও মৌ. এনামুল হক রনি। সভাপতির ভাষণ দান করেন। এতে জামা'তের নবনির্বাচিত আমেলার ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

জহির আহমদ মিয়াজী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুসরাতাবাদে খেলাফত দিবস

গত ২৫/০৫/২০১৩ তারিখ শনিবার নুসরাতাবাদ (চরদুঃখিয়া) লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে খেলাফত দিবস উদযাপন করা হয়।

এতে সভাপতিত্ব করেন প্রেসিডেন্ট আশরাফ জাহান (রুনি)। এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন ফাহাত সুলতানা (ইকরা), নযম পাঠ করেন রাজিয়া সুলতানা (আলো)। বক্তৃতা পর্বে ইসলামী খেলাফত ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জাহানারা বেগম, পুন:প্রতিষ্ঠিত ইসলামী খেলাফত কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আশরাফ জাহান (রুনি)।

দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্ত হয়।

লাজনা ইমাইল্লাহ্ নুসরাতাবাদ

গত ২৩/০৩/২০১৩ তারিখ শনিবার নুসরাতাবাদ (চর দুঃখিয়া) লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। এতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন, ইতি বেগম, নযম পাঠ করেন ফাহাত সুলতানা (ইকরা)। ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে মান্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন রাজিয়া সুলতানা (আলো), চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর আগমন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন আশরাফ জাহান (রুনি)। দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রমের সমাপ্তি হয়।

খাতুনে জান্নাত (মুক্তা)

নাসেরাত দিবস উদযাপন

গত ২৫/০৫/২০১৩ নুসরাতাবাদ (চরদুঃখিয়া) লাজনা ইমাইল্লাহ্র উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। প্রেসিডেন্ট আশরাফ জাহান (রুনি)-এর সভাপতিত্ব উক্ত সভার কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজিয়া সুলতানা , অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফাহাত সুলতানা, দোয়া ও আহাদনামা পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন ফতেমা খাতুন (স্মৃতি)। এরপর নাসেরাত বোনদের প্রতিযোগিতা শুরু হয়। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল কুরআন তেলাওয়াত, নযম, কাসিদা ও খেলাধূলা। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভাপতি। দোয়ার মাধ্যমে নাসেরাত দিবসের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাজিয়া সুলতানা (আলো)

লাজনা ইমাইল্লাহ্ কুমিল্লায় খেলাফত দিবস

গত ২১শে জুন ২০১৩ শুক্রবার লাজনা ইমাইল্লাহ্ কুমিল্লার উদ্যোগে খিলাফত দিবস উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন মিসেস রাবেয়া হক। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত, হাদীস পাঠ, নযম পাঠের পর খিলাফতের ওপর বিভিন্ন বক্তাগণ বক্তৃতা রাখেন। বক্তৃতার বিষয়গুলো হল যথাক্রমে খলীফার আনুগত্য, খলীফা নির্বাচন আল্লাহ্ করেন, খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, খলীফা (আই.) এর নির্দেশ এবং নসিহকমূলক বক্তব্য প্রদান করেন যথাক্রমে নাসিমা বেগম, সৈয়দা মাহমুদা হেলাল, শারমিন আক্তার, ও আমাতুল মজিদ। সবশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। উক্ত দিবসে লাজনা ও নাসেরাতসহ মোট ২১ জন সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

আমাতুল মজিদ

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র তরবিয়তী সপ্তাহ পালন

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ২৫/০৫/২০১৩ হতে ০২/০৬/২০১৩ দশদিন ব্যাপী তরবিয়তী সপ্তাহ সফলতার সাথে পালন করা হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত তরবিয়তী সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো ছিল সঠিক সময়ে পাঁচওয়াক্ত নামায আদায়, তাহাজ্জুদ নামায পড়া, প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পুস্তক পড়া, সপ্তাহে একদিন হুযূর (আই.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী নফল রোযা পালন এবং সপ্তাহ শেষে একটি বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এই দশদিন ব্যাপী তরবিয়তী সপ্তাহ ১৫ জন নিয়মিত ও ২০ জন অনিয়মিত সদস্য অংশগ্রহণ করেন।

উম্মে কুলসুম চায়না

সন্তান লাভ

মহান আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা গত ১৫ মে, ২০১৩ এক পুত্র সন্তান লাভ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ।

সন্তানের নাম রাখা হয়েছে ***'আতাউস সামাদ (রঙ)'***। দাদার নাম আহমদ আয়াতুর রহমান ফারুক (এ্যাডভোকেট, বাজিতপুর জামা'ত), কিশোরগঞ্জ।

আমরা আমাদের সন্তানের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, মেধা এবং সে যেন প্রকৃত ইসলামের সেবায় নিবেদিত প্রাণ হয় সেজন্য জামা'তের সকলের কাছে দোয়ার আবেদন করছি।

দোয়াপ্রার্থী
নাছের আহমদ ও
সরমিলা সুলতানা (রিংকি)
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

ঈশ্বরদী/নূরনগরে দু'দিন ব্যাপী তালিম ক্লাশ ও ১ম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

ঈশ্বরদী/নূরনগর লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী তালিম ক্লাশ অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত ক্লাসে সিলেবাস অনুযায়ী ক্লাস নেয়া হয়।

এছাড়া গত ১৪/০৬/২০১৩ ১ম স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

উক্ত ইজতেমায় প্রথম অধিবেশন সকাল ১১টায় আরম্ভ হয়। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম পাঠের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগীতা নেয়া হয়।

শেষে পুরস্কার বিতরণ, লাজনার প্রেসিডেন্টের সমাপ্তি ভাষণ এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

রওশনয়ারা

২৫ রমযানের মধ্যে তাহরিকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ ও বিশেষ দোয়া প্রাপ্তি প্রসঙ্গে

আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ দু'টি ঐশী সাহায্যপুষ্ট কর্মসূচী। খেলাফতে আহমদীয়ার অনুগত্যে এই কর্মসূচিগুলোতে বেশী বেশী ওয়াদা লিখিয়ে তা পরিশোধে বিশেষ বরকত লাভ হয়। আপনারা এও জানেন যে, রমযান একটি পবিত্র মাস এবং হাদীসে আছে যে, এ মাসে আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঝড়ের গতিতে মালী কুরবানী করতেন। প্রতি বছরের মতো এবারেও হুযূর (আই.)-এর নিকট রমযান মাসে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা সম্পূর্ণ পরিশোধকারীদের উদ্দেশ্যে দোয়ার জন্য পত্র লিখা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এই উদ্দেশ্যে আপনাদের নিকট আহ্বান করা যাচ্ছে–

১। এই ঘোষণা আপনার জামা'তের সকল সদস্য, ছাত্র-ছাত্রী, পুরুষ বা মহিলা নির্বিশেষে নবজাতক থেকে বয়োবৃদ্ধ, সকলের নিকট পৌঁছান।

২। সকলকে ২৫শে রমযানের পূর্বেই নিজ নিজ লিখিত ওয়াদা পরিশোধ করতে উৎসাহিত করুন।

৩। যারা ওয়াদা লিখান নি, তাদেরকে ওয়াদা লিখিয়ে তা পরিশোধ করতে উৎসাহিত করুন।

৪। চেষ্টা করা উচিত যেন পূর্বের বছর হতে ওয়াদা ও আদায় বৃদ্ধি পায়।

৫। ২৫ রমযানের মধ্যে এরূপে তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের সম্পূর্ণ ওয়াদা পরিশোধকারীদের নাম, ওয়াদা ও আদায়ের দু'টি পৃথক তালিকাসহ প্রতিবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করুন, যাতে করে হুযূর (আই.)-এর খেদমতে দোয়া চেয়ে সময় মতো প্রতিবেদন পেশ করা যায়। ন্যূনতম নিম্ন বর্ণিত মোবাইল নম্বরে মোট আদায় ও আদায়কারীর সংখ্যা এস.এম.এস করুন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল ও ইনসান আলী ফকির
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭১৪-০৮৫০৭০

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী

১ প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এজন্যে প্রত্যেক জামাতে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে একদিন নির্ধারিত করে নিন।

২ প্রত্যেকদিন দু' রাকাআত নফল নামায (ইশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত অথবা যুহরের নামাজের পর) আদায় করুন।

৩ সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার পাঠ করুন।

৪ রাব্বানা আফ্‌রিগ আলাইনা সাব্‌রাওঁ ওয়াসাব্বিত আক্বদামানা ওয়ানসুরনা আলাল ক্বাওমিল কাফিরীন [সূরা বাকারা ঃ ২৫১] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর।

৫ রাব্বানা লা তুযিগ ক্বুলূবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্'হাব [সূরা আলে ইমরান– ৯] প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে হেদায়াত দেয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না এবং তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমিই মহান দাতা।

৬ আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফি নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম [আবূ দাউদ ঃ কিতাবুস সালাত] প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা [অবিশ্বাসীদের মোকাবেলায়] তোমাকে তাদের অন্তরে [ঢালস্বরূপ] রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৭ আস্‌তাগফিরুল্লাহা রব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়াআতুবু ইলায়হে। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন।

অর্থ ঃ আমি আমার প্রভু-প্রতিপালক আল্লাহতাআলার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তারই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

৮ সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা মুহাম্মদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ ঃ আল্লাহ্‌তাআলা তাঁর প্রশংসাসহ অতি পবিত্র। তিনি অতি পবিত্র অতি মহান। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সঃ)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৯ দুরূদ শরীফ। (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

হুযূর (আই.)-এর এই আহ্বান বাস্তবায়ন করার জন্য স্থানীয় জামাত ও জামাতের সমস্ত অঙ্গ সংগঠনকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ ন্যাশনাল কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

New Vol. No. 76 | 2nd Issue

The Ahmadi
Fortnightly

31th July, 2013 Tk. 18.00
Regd. No. D. A.-12

সেই ১৯৮৮ সাল থেকে

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি খাবার
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

"এছাড়া আমাদের আর কোথাও কোন শাখা নেই"
মান এবং পরিমাণের নিশ্চয়তায় ধানসিড়ি রেস্তোরা-১, ধানসিড়ি রান্না আপনার ঘরের রান্না

cta
CTA International Ltd.

CTA is your one-stop business entry point for outsourcing, sourcing and general business services in China & Bangladesh. A reliable business partner with the required technical & organizational expertise you need for successful business.

Ch. Tahir Ahmad
No.404, Building 02, Kebei Garden, Keqiao,
Shaoxing, Zhejiang, P.R.China
Telephone: +86-137-77323879
Fax: +86-575-84817780
E-Mail: ctahkg@gmail.com

House No.26, 2nd Floor, A2 & B2, Road # 02, Block-B,
Niketon Housing Society, Gulshan-01, Dhaka
Bangladesh.
Telephone: +880-1714-069952
E-Mail: contact.puma@gmail.com

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com